

মীরাটলাল



অরুণিমা প্রকাশনী

—দুই টাকা—

প্রথম সংস্করণ—পৌষ, ১৩৬৪

প্রকাশক—

দেবেশ দত্ত বি, কম্,

অরুণিমা প্রকাশনী

২, জগবন্ধু মোদক রোড

কলিকাতা—৫

মুদ্রাকর—

অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২, জগবন্ধু মোদক রোড

কলিকাতা—৫

প্রচ্ছদ—সুব্রত দত্ত

বাঁধাই—চক্রবর্ত্তী বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

স্বর্গত পিতৃদেবের মহান্ আত্মাকে





প্রকাশকের নিবেদন

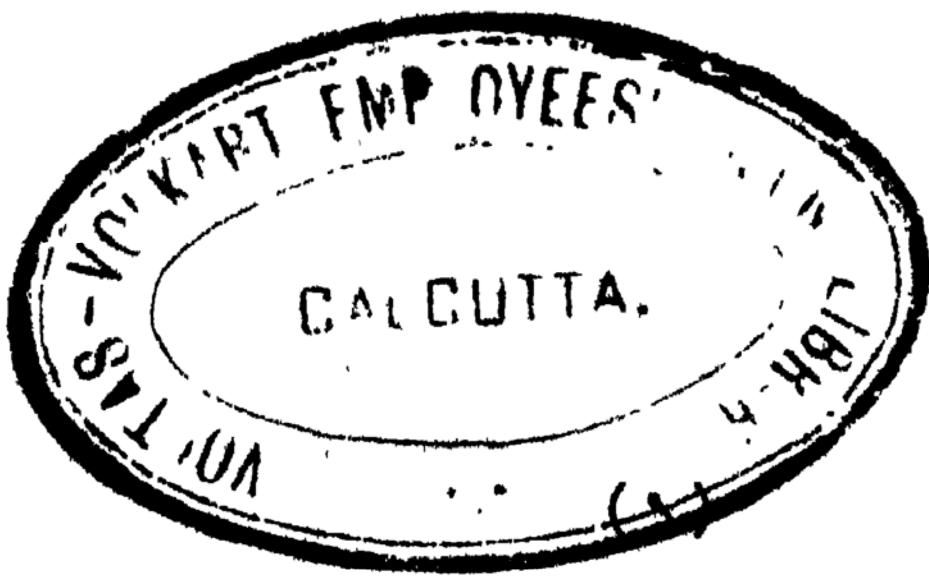
'হারানো ছন্দ' এই বছরের শারদীয় বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। অসংখ্য পাঠক হারানো ছন্দের অপূর্ব কথাশিল্প, মনোরম বর্ণনা বিন্যাস এবং হৃদয়গ্রাহী কাহিনীর শতমুখে প্রশংসা প্রসংঙ্গে লেখকের নাম জানানোর জন্যে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু লেখকের অনুমতি পাওয়া যায়নি বলে তা জানানো সম্ভব হয়নি পত্রিকাখানির পক্ষে। একাধিকবার চাওয়া সত্ত্বেও সে অনুমতি লেখকের কাছ থেকে পাওয়া গেল না আজও, তাই আমার পক্ষেও জানানো সম্ভব হ'ল না রচয়িতার নাম—তার জন্যে আমি দুঃখিত।

লেখকের নাম গোপনের পেছনে সৃষ্টির সাফল্যের সম্পর্কে ত্রাসজনিত কোন কারণ থাকে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সেইরকম কোন কিছু নাও মনে করা যেতে পারে কারণ পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে লেখকের রচনা সাফল্য মণ্ডিত সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অতএব, ভয় জাতীয় যদি কোন কারণ সত্যি করে থাকত তাহ'লে তা শারদীয় আকাশে শরতের মেঘের মতই কেটে গিয়েছে লেখকের মন থেকে।

তবে কেন ছদ্মনাম ধারণ ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি যেটুকু বুঝেছি তা থেকে বলতে হয় আত্মপ্রচারে কুণ্ঠিত বলে লেখক প্রকাশ করতে চাননি নিজের নাম।—নিজেকে 'জাহির' করতে পারার অক্ষমতা ছাড়া আর কোন কারণ নেই লেখকের ছদ্মনাম ধারণের পেছনে। লেখক পরিচিতি সম্বন্ধে একটি কথাই যথেষ্ট যে, তিনি একজন প্রকৃত সাধক। অন্য কোন প্রবীন প্রকাশকের হাতে না দিয়ে আমার মত একজন নবীন প্রকাশকের হাতে দেওয়ার যে মাত্র একটা কারণ আছে তা দিয়েই বলতে পারা যায় উদারতা, সপ্রীত মনোভাব, সাধনা প্রভৃতি মহৎ গুণগুলো তাঁকে সাধারণের অনেক উঁচুতে তুলে ধরেছে। এ বদান্যতার জন্যে আমি ঋণী।

ইতি—

প্রকাশক



সেই ছিল তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। অমিতাভের পিতা যাহা কিছু খুদকুঁড়ো রাখিয়া গিয়াছেন তাই দিয়া এবং নিজের যৎসামান্য উপার্জন দ্বারা অমিতাভের মাতুল অমিতাভকে মানুষ করিয়াছেন। অমিতাভের মাতুল শশাঙ্কমোহন বিয়ে থা করেন নাই। কলিকাতার কোন এক ষ্টেটে ৩০ বৎসর বয়সে ১০ টাকা বেতনের গোমস্তার কাজে তিনি ঢুকিয়াছিলেন। সেই মাহিনা বছরে দু'তিন টাকা হারে বাড়িয়া আজ ২৫ বৎসরে ৭৫ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। শশাঙ্কমোহনের বর্তমানে বয়স হইয়াছে ৫৫ বৎসর। পাঁচ বৎসর পূর্বে অমিতাভ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিল পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক দিন আগেই নিঃশেষিত অতএব যেমন তেমন করিয়া একটি চাকুরী যোগাড় আর না করিলে হইবে না। মামার আয়ের দরুণ মাত্র ৭৫ টাকায় ঘর ভাড়া দিয়া দুইটা পেট ভদ্রভাবে চলে না। আর তা ছাড়া মামার বয়স হইয়াছে, এখন তাঁহাকে বিশ্রাম দেওয়াই তাহার কর্তব্য। দৈনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক দরখাস্ত দিয়া অবশেষে বিহারে এই চাকুরীটী সে পাইয়াছে। অমিতাভের মাতুল অমিতাভের বিবাহের জন্য সম্প্রতি বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অমিতাভ অফিসার গ্রেড পাইয়াই মাতুলকে চাকুরী ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছিল কিন্তু শশাঙ্কমোহন বলিয়াছিলেন, বাড়িতে বসে বসেই বা করব কি, তবু একটা কাজ নিয়ে তো থাকা যায়, বাবা। তুই বিয়ে থা কর আগে তখন না হয় চাকরী ছেড়ে দিলে হবে।

শশাঙ্কমোহন অমিতাভের জন্য অনেক মেয়ে দেখিলেন কিন্তু পছন্দ আর হয় না। অবশেষে একটি মেয়েকে তাঁহার খুবই পছন্দ হইয়া যায়। মেয়েটি অসামান্য সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু বিপদ বাধিল একটি জিনিষে—পাত্রী বি, এ পাশ। সেই মেয়ের সঙ্গে অমিতাভের বিবাহ দিবার জন্য শশাঙ্কমোহনের এমনই ঝোঁক চাপিয়া গেল যে তিনি পাত্রীর পিতা ভুবনেশ্বর চৌধুরী পাত্রের লেখাপড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া ফেলিলেন, অমিতাভ গ্র্যাজুয়েট।

ভুবনেশ্বর উত্তরে বলিয়াছিলেন, মাপ করবেন আমায়, ও-কথা জিজ্ঞাসা করাই আমার অন্যায় হয়েছে কারণ যখন পাত্র অফিসার তখন নিশ্চয় সে গ্রাজুয়েট।

শশাঙ্কমোহন গর্বের সহিত ঘাড় দোলাইয়া বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই,

আরে মশাই আমার অমিতাভ গ্র্যাজুয়েটেরও বাবা। যেমন সুপুরুষ দেখতে বিদ্যা বুদ্ধিও তেমনি প্রখর। তার ওপর আবার সাহিত্যিক। মাসিক পত্রিকায় ছদ্ম নামে গল্প লেখে। বলেছি আপনাকে, অমিতাভের পিতা অর্থাভাবের প্রচণ্ড চাপে তাঁর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারেন নি বলে শেষ ইচ্ছে জানিয়ে গেচেন আমায় যেন অমিতাভ ভবিষ্যতে একজন লেখক হয়।

পাত্রীর পিতা ভুবনেশ্বর চৌধুরী প্রাক্তন গেজেটেড অফিসার। শ্বশুর মহাশয়ের বিরাট পাটের ব্যবসার একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনিই। সাহেবী চালে থাকেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নামে লেখে বলুন তো?

শশাঙ্কমোহন বিনীতভাবে জানাইলেন, মায়ামৃগ।

ভুবনেশ্বর ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, কই এ নাম তো শুনিনি।

শশাঙ্কমোহন যেভাবে তাঁহার ভাগনের সাহিত্য প্রতিভার কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাতে অকস্মাৎ এইরূপ উত্তর পাইয়া একটু দমিয়া গিয়া কহিলেন, শোনেন নি বুঝি, নতুন লেখক কিনা, বেশী তো লেখেনি। এই সবে দু'চারটি গল্প লিখেছে।

ভুবনেশ্বরবাবু চুরুট দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, ও কিছু নয়। বিয়ে হ'য়ে গেলে সাহিত্য করতে আমি বারণ করে দেবো। ওতে কিছু হয় না। শুধু শুধু energy নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলা দেশে প্রচুর সাহিত্যিক হ'য়ে গেছে। সাহিত্যিকরা না খেতে পেয়ে সব শুকিয়ে মরচে।

শশাঙ্কমোহন ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিলেন, ও-কথা বলবেন না। বড় বড় সাহিত্যিকরা কত বাড়ী করচে, গাড়ি করচে, কথায় কথায় প্লেনে করে হিল্লি দিল্লী ঘুরে বেড়াচ্চে। বলিয়া একমুখ হাসিতে লাগিলেন শশাঙ্কমোহন।

ভুবনেশ্বর বলিলেন, কিন্তু সে আর কটা? বড় সাহিত্যিক হওয়া তো যা তা কথা নয়। কম খাটে নাকি ওরা। একজন বড় সাহিত্যিক হ'তে গেলে যে 'এফর্ট' লাগে যে এনার্জি খরচা করতে হয় চাকরীর ব্যাপারে তা এক্সার্ট করলে অনেক বেশী উন্নতি করা যায়। ওসব কোন কাজের কথা নয়। তবে আপনার ভাগনেটি যখন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বুদ্ধিশুদ্ধি খুব প্রখর, আর সব চেয়ে বড় কথা হচ্চে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে—

শশাঙ্কমোহন স্বতস্ফূর্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, একশোবার একশোবার—

ভুবনেশ্বর বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তখন আমি তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব বৈকি।

কথা সেদিন ঐ পর্যন্তই হইল।

ভুবনেশ্বরবাবু খোঁজ খবর লইয়া জানিলেন, অমিতাভ সত্যই বিহারের একটি মার্চেণ্ট অফিসের অফিসার এবং চারিশত টাকা বেতনও পায়। অমিতাভের ছবিও শশাঙ্কমোহনের কাছ থেকে নিয়ে দেখিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী অমলাদেবীকে দেখাইলেন। ভুবনেশ্বরের স্ত্রী ছবিটি আবার কন্যা শাশ্বতীকে দিয়া বলিলেন, ছাথ বাপু ছাথ, তোরা আবার সব কলেজে পড়া মেয়ে। নিজে দেখে মতামত দে।

শাশ্বতী কলেজের বান্ধবী অনিমার সহিত গল্প করিতেছিল। সে লজ্জায় বলিয়া উঠিল, আমি আর কি দেখব। তোমরা কি আর আমার কিছু খারাপ করবে।

অনিমা একরকম প্রায় ছুটিয়া গিয়া অমলাদেবীর হাত হইতে ছবিটা লইয়া বলিল, বাঃ চমৎকার চেহারা তো! ছেলে কি করে মাসিমা? নাম কি?

অমলা দেবী হাসিয়া উত্তর দিলেন, বিহারের একটি মার্চেণ্ট অফিসের অফিসার। নাম অমিতাভ মিত্র।

অনিমা জানিতে চায়, বিয়ের পরে শাশ্বতী কি বিহারে চলে যাবে?

অমলাদেবী বলিলেন, উপস্থিত মাস দুই যাবে না, বিয়ে হ'য়ে গেলে দরখাস্ত ক'রলে ছেলে অফিস থেকে ওখানে কোয়াটার পাবে। এইসব বিলি ব্যবস্থা হতে করতে তা মাস দুই তো লাগবে। কোয়াটার পেলেই অমিতাভ ওখান থেকে চিঠি লিখলে অমিতাভের মামা তখন শাশ্বতীকে বিহারে নিয়ে যাবেন।

অমলাদেবী একটা কাজের অছিলায় সেখান থেকে চলিয়া গেলেন মেয়ে এবং মেয়ের বান্ধবীকে একসঙ্গে ছেলের ছবিটি দেখার সুযোগ দিয়া।

মা চলিয়া যাইতে শাশ্বতী মৃদু হাস্তে অনিমাকে বলিয়া উঠিল, কিরে ছবি দেখতে দেখতে মজে গেলি নাকি? দেখিস, আমার মুখের গ্রাস আবার কেড়ে নিসনি যেন।

অনিমা শাশ্বতীর রসিকতার জবাব দেয়, সত্যি কেড়ে নেওয়ার মত ভাই। দেখ ভাল ক'রে—বলিয়া ছবিটি শাশ্বতীর মুখের সামনে ধরিয়া বলিতে লাগিল, কলেজে তো অনেক ছেলেই দেখেছি কিন্তু এরকম সুন্দর চেহারা কারুর দেখিনি।

শাশ্বতী বলে, সত্যিই তো রে, তোর চোখ আছে দেখছি। দেখতে বেশ

সুন্দর হো! তবে বড় বেশী সুন্দর ভাই, আবার মাকাল ফল নয় তো! বলিয়াই হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল। অনিমাও হাসিয়া উঠিল।

ওদিকে শশাঙ্কমোহন অমিতাভকে এই পাত্রীর কথা লিখিলেন। লিখিলেন যে তাঁহার খুব পছন্দ হইয়াছে। পাত্রী রূপেগুণে মা লক্ষ্মী। অমিতাভকে শীঘ্রই ফটো পাঠাইবেন একথাও জানাইয়া দিলেন।

অমিতাভ মাতুলের পত্রের উত্তরে জানাইল যে, তাহাকে ফটো পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি যাহা ভাল মনে করিবেন তাহাই যেন তিনি করেন। তিনি তাহাকে যা নির্দেশ দিবেন সে শুধু তাহাই করিবে।

এই উত্তর পাইয়া শশাঙ্কমোহনের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন সার্থক হইয়াছে অমিতাভকে মানুষ করা। অমিতাভ যে শশাঙ্কমোহনের পুত্রের অভাব পূর্ণ করিয়াছে একথা সেদিন শশাঙ্কমোহনের বড় বেশী করিয়া মনে হইতে লাগিল। শশাঙ্কমোহন যদি বিবাহ করিতেন, শশাঙ্কমোহনের যদি পুত্র থাকিত, তাহলে সে পুত্র কি করিত তাহা শশাঙ্কমোহনের জানা নাই; তবে অমিতাভ যাহা করিতেছে তাহার অধিক নিশ্চয়ই সে কিছু করিতে পারিত না— এই কথা সেদিন শশাঙ্কমোহন মনে মনে ভাবিতে অপরিসীম আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া উঠিল।

শশাঙ্কমোহন বরকর্ত্তা হিসাবে একটি পয়সাও দাবী করিলেন না। তবে ভুবনেশ্বর প্রচুর দান সামগ্রী এবং যৌতুক দিলেন, মেয়ের গহনাগাটি এবং ছেলের হীরার বোতাম থেকে আরম্ভ করিয়া দু'জনকে রিষ্টওয়াচ', বিভিন্ন রকমের আসবাব, বাসন-কুসুন প্রভৃতি।

যথাসময় মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। বর দেখিয়া খানদানী বংশোদ্ভব কুলীন ভুবনেশ্বর চৌধুরীর সমস্ত ধনী আত্মীয়-পরিজন দু'মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সকলে বলাবলি করিতে থাকেন, বাস্তবিক ভুবনেশ্বর চৌধুরীর পছন্দ আছে। নিজের মেয়ের সঙ্গে ঠিক মানিয়ে রূপবান এবং গুণবান কি চমৎকার জামাই না ক'রেছেন!

শশাঙ্কমোহন এক মাসের জন্য বেশ একটি বড় বাড়ী ভাড়া লইলেন। সেই বাড়ীতে বৌ-ভাত এবং ফুলশয্যার ব্যবস্থা হইল।

অমিতাভ এবং শাশ্বতীর ফুলশয্যার রাত্রি।

মেজমামা অমিতাভকে বসিতে বলিয়া ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করিতে

গিয়াছেন নববধূকে লইয়া। অমিতাভ একদৃষ্টে কপাটের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে তাহার দাম্পত্য জীবনের কথা যে দাম্পত্য জীবন আজ তিন দিন হইল শুরু হইয়াছে। অচিরেই অমিতাভের কয়েকজন বিবাহিতা এবং কুমারী আত্মীয়া নূতন বৌকে লইয়া অমিতাভের কাছে আসিয়া হাজির হইল। অমিতাভের মন আনন্দে দুলিয়া উঠিল। সে একবার শাশ্বতীকে দেখিয়া লইবার লোভ সামলাইতে পারিল না, হ্যাঁ সুন্দরী বটে শাশ্বতী! শাশ্বতীর অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে নববধূর বেশটি এমন অপূর্ব মানাইয়াছে যে, একবার দেখিলে চোখের পাতা ফেলা যায় না। সত্যই এ সৌন্দর্যের শেষতল খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। অমিতাভের আত্মীয়ারা অমিতাভের বিহ্বল ভাব দেখিয়া কেহ বা অপর আর একজনের গা টিপিয়া মুচকী হাসিল, কেহ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, কেহ বা দুষ্টামি করিয়া দু'একটি সরস উক্তি অমিতাভকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। তাহাদের মধ্যে যাঁহার সহিত অমিতাভের ভ্রাতৃজায়ার সম্পর্ক তিনি হাসিতে হাসিতে কহিলেন, কি গো ঠাকুরপো আর বুঝি ধৈর্য ধরতে পাচ্ছ না।

অমিতাভ সহাস্যে উত্তর দিল, ধৈর্যের এই তো শুরু বৌদি, এর ভেতর অধৈর্য হ'লে ধৈর্যের বাঁধ যে কথায় কথায় ভাঙবে। কত সাধ্যি-সাধনা করতে হবে অনুরাগের লোভে, কত ধৈর্য ধারণ ক'রে মানভঞ্জন করতে হবে। জীবন প্রাঙ্গণে ঐ তো একটাই বস্তু আছে যার কল্যাণে আনন্দের সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে ধরে থাকলে সমস্ত দুঃখকে ছাপিয়েও একদিন না একদিন সুখ আপনি এসে ধরা দেয়। অতএব, ও কথাটা খুব ভালভাবেই বুঝি, বৌদি। এত সহজে ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে কি চলে?

বৌদি একগাল হাসিয়া বলিলেন, দেখলে বৌ দেখলে, তোমার স্বামীটির ভেতর কত ক্ষোভ জমা হ'য়ে আছে। দুঃখটুকু কত কি আওড়ান হ'ল, এখন তোমায় পেয়ে দেখ কি আনন্দই না হয়েচে, নিজের মুখেই স্বীকার করে ফেলল। ধৈর্য ধরে আছে ব'লেই তোমায় পেল আর তোমায় পেল বলেই আনন্দের সন্ধান মিলল। ভাই, আমাদের ভাইটি তোমার তপস্যায় মগ্ন হ'য়ে কত দুঃখই বরণ করেচে, আহা কত ধৈর্য ধরেচে। বলি কত জন্ম ধরে এই দুঃখ আর ধৈর্য ধারণ ক'রে আছ শুনি?

অমিতাভ কহিল, আমি তো জাতিস্মর নই বৌদি যে, পূর্বজন্মের কথা মনে থাকবে। তবে এ জন্মের কথা বলতে পারি কোন মেয়ের কথা যা বিয়ের

কথা ভাববার অবকাশ কোনদিন পাইনি আইবুড়ো অবস্থায় বটে, তবে এখন বুঝতে পাচ্ছি অবচেতন মনে বোধ হয় আমি এই রকম বধূর জন্যেই কামনা করে এসেচি। তা না হ'লে মামার ভাষায় 'রূপেগুণে' এমন লক্ষ্মী মেয়েকে কখনও বধূ হিসেবে পাই! বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

বৌদি বলিলেন, বাবা তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে। যতই হোক সাহিত্যিক লোক তো। যাক আর বিরক্ত করব না। আমরা চলি। বলিয়া দু'জনের কাছ থেকে বিদায় লইয়া সকলেই চলিয়া গেলেন।

সবাই ঘর ত্যাগ করিলে অমিতাভ সর্বপ্রথম দুয়ার অর্গলরুদ্ধ করিল। তারপর ধীরে ধীরে শাশ্বতীর পাশটিতে গিয়া বসিতে শাশ্বতী মুখটী একটু নামাইল। অমিতাভ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার সুন্দরী নববধূর এই সলজ্জ ভাবটি মোহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে অমিতাভ শাশ্বতীর ঘোমটার কাপড়টি সরাইয়া ডাকিল, শাশ্বতী। শাশ্বতী মুখ তুলিল।

ঘরের বাইরে বিপুল হর্ষধ্বনি শোনা যাইতেই শাশ্বতী খাটো গলায় কহিল, ওঁরা বোধ হয় আড়ি পেতেচেন। খড়খড়ি তুলে দেখচেন।

অমিতাভ বুঝিল শাশ্বতী অতিশয় লজ্জা পাইতেছে অতএব খড়খড়িগুলি বন্ধ করার প্রয়োজন। আমতাভ উঠিয়া গিয়া খড়খড়িগুলি বন্ধ করিতে গেলে যাহারা আড়ি পাতিয়া দেখিতেছিল তাহারা যেদিকে পারিল সরিয়া দাঁড়াইল।

শাশ্বতী অমিতাভকে সরসকণ্ঠে কহিল, তুমি যে বৌদিকে বললে তুমি মান অভিমানের কথাটা ভালভাবে বোঝ, তবে কি কিছু সন্দেহ করতে পারি?

অমিতাভ শাশ্বতীর সুন্দর চিবুকটি নাড়িয়া দিয়া বলিল, নাগো সুন্দরী, ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আমার ধৈর্য ধারণ শিক্ষা ঠেকে নয় দেখে শেখা। আমার কয়েকজন বিবাহিত বন্ধুর কাছ থেকে শুনেই আমার এই অভিজ্ঞতা। আর সে সম্বন্ধে আমি বলেচি তো, কোন মেয়ের কথা ভাববার অবকাশ আমি কুমার জীবনে কখনও পাইনি, তবে সত্যিই শাশ্বতী তোমায় পেয়ে কি মনে হ'চ্ছে জানো, মনে হচ্ছে, তুমি সত্যিই তপস্যারই বস্তু। তাইতো তোমার মত পরমাশ্চর্যের সঙ্গে আমার মিলন।

শাশ্বতী কহিল, ভুল, তুমিই আমার তপস্যার বস্তু। তুমি পূর্বজন্মের কথা জান না কিন্তু আমি জানি। জন্মজন্মান্তর ধরে তপস্যা ক'রে এসেচি, সাধনা ক'রে এসেচি আমিই তোমায় পাবার জন্যে, তাইতো তোমায় পেয়েচি।

অমিতাভ কহিল, তাহলে দেখচি তুমি প্রকৃত জাতিস্মর! পূর্বজন্মের কথা

তোমার মনে আছে। তুমি একেবারে অতি মানবের পর্যায়! সাক্ষাৎ দেবী যে তুমি! দেবীকে যে আবার মানবের স্পর্শ করার অধিকার থাকে না, শুধু দূর থেকে নমস্কার ছাড়া কিছু নয়!

শাশ্বতী অমিতাভের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, ছিঃ একি বলচ। তুমিই দেবতা আর আমি তোমার পূজারিণী, তুমি আকাশ আমি বাতাস, তুমি নদ আমি নদী।

অমিতাভ কহিল, কিন্তু একটু ত্রুটি রয়ে গেল যে, মাঝের উপমাটায়, প্রথম এবং শেষটা খুবই চমৎকার। দু'জনের পরস্পরের মিলন হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে কিন্তু আকাশ আর বাতাসের মিলনটাকে যে বৈজ্ঞানিকরা কোনমতেই মেনে নিতে পারবে না। কাব্য এবং ভাবালুতার বিরুদ্ধে তারা সবসময় তো খাপ খুলেই আছে।

শাশ্বতী কহিল, ঐখানেই তো কথা। আকাশের সঙ্গে বাতাসের মিলন হয় না বলেই আমরা জানি কারণ বাতাস যত উপরেই উঠুক না কেন আকাশের নাগাল পায় না। কিন্তু বাতাস একান্ত বাসনা নিয়ে যে আকাশের সঙ্গে মেলবার অভিলাষে দিক থেকে দিগন্তে ছুটে বেড়ায়, প্রেমের জোয়ারে স্ফীত হ'যে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে, কোন এক মুহূর্তে অবশ্যই তাদের মিলন হ'য়ে যায়; সে কি আর বৈজ্ঞানিকরা দেখতে পায়, না, তারা বৈজ্ঞানিকদের দেখিয়ে কিছু করে—বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল।

অমিতাভ অভিভূতের মত শুনিতেছিল শাশ্বতীর কথা। শাশ্বতীকে আরও কাছে টানিয়া কহিল, চমৎকার তো তোমার যুক্তি! অপূর্ব কথা বলতো তুমি!

রাস্তার দিকের জানালা দিয়া কেহ আড়ি পাতিতে পারিবে না বলিয়া অমিতাভ সেইটি খুলিয়াই রাখিয়াছিল। সেই উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া এক ফালি চতুর্দশীর চাঁদ তির্যকভাবে আসিয়া এই নব-দম্পতিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির এই অবদান তুচ্ছ করিয়া দিয়াছে কৃত্রিম নীল বাতিটিকে। তাহাদের দু'জনকে একেই তো অপূর্ব সুন্দর দেখাইতেছিল তার উপর আবার চাঁদনী রাতের এই ঝলমলানি, যেন সৌন্দর্যের মেলা বসিয়া গিয়াছে। শাশ্বতী কহিল, তোমার মত পণ্ডিত হ'তে না পারি তবে লেখাপড়া একেবারে যে শিখিনি তা তো নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটে দরজা তো পেরিয়েছি।

অমিতাভ অকস্মাৎ যেন কিরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। অবাক বিস্ময়ে সে কহিল, তুমি বি-এ পাশ!

শাশ্বতী একটু অভিমানের সুর মাখাইয়া বলিল, আহা তুমি যেন জাননা। আর যদি নাও শুনে থাক তাহলে আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস কর না? বাবা! এমনভাবে আশ্চর্য হ'য়ে গেলে, যেন আমি বি-এ পাশ করতেই পারি না। পড়াশুনো, পাশকরা সব যেন তোমার একলারই একচেটে! বিশ্বাস না হয়, বেশ, ধূলো পা করতে যখন যাব তখন সার্টিফিকেটগুলো আনলেই তো হবে।

অমিতাভ প্রায় মিনতি করিয়া কহিল, সব জেনেশুনে তুমি কেন আমায় খোঁচা দিলে শাশ্বতী?

শাশ্বতী বিস্মিত হইয়া বলিল, কি সব জেনে-শুনে, গো? কি জানবার কথা তুমি বলচ?

অমিতাভ গম্ভীর হইয়া কহিল, পাশ আমি একটার বেশী দু'টো করিনি, শাশ্বতী। অতএব ওটা যে আমার মোটেও একচেটিয়া নয়, তা তুমি খুব ভালোভাবেই জানো।

শাশ্বতী একটু সোজা হইয়া বসিল। অমিতাভ অপেক্ষাও গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিল, প্রশ্ন করিল বলিলে ভুল হইবে, প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিল বলিলেই বোধ করি ঠিক বলা হইবে, তুমি গ্র্যাজুয়েট নও? বি-এ পাশ তুমি করনি?

অমিতাভ পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, না, ম্যাট্রিক পাশ ছাড়া আর কোন পাশ করা আমার সৌভাগ্যে ঘটেনি। অমিতাভ একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিল, তুমি দেখচি একটু বেশী রকমের ব্যস্ত হ'য়ে পড়লে? গ্র্যাজুয়েট না হ'য়ে তোমার কাছে খুব অন্যায় ক'রে ফেলেচি দেখছি। তা এখুনই গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে নিতে হবে নাকি?

শাশ্বতী অমিতাভের এই বিদ্রূপের উত্তর বিদ্রূপ করিয়াই দিল। আর বিদ্রূপ না করাটাই তো আশ্চর্য! সে কি অশিক্ষিতা যে মুখ বুজিয়া হজম করিয়া যাইবে! কত বড় 'কালচারাল' ঘরের মেয়ে ও! শাশ্বতী কহিল, হ্যাঁ, যদি গ্র্যাজুয়েট না হও তবে আগে গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে নাও তারপর আমায় বধূ হিসেবে ঘরে তুল। আমার শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে তোমার শিক্ষা-দীক্ষার কিছুতেই মিল হ'তে পারে না। ছি ছি! কি সর্বনাশ হ'ল আমার। তোমার মামা এত বড় একটা হীন কাজ করলেন! মিথ্যা ক'রে তোমায় বিদ্বান্ বলে বাবার কাছে পরিচয় দিয়েচেন। স্রেফ টাকার লোভে, এখন বুঝতে পাচ্চি।

অমিতাভ স্তব্ধ হইয়া গেল। অপরিসীম ধৈর্য তাহার আছে বৈকি, শান্ত

স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, মাত্রাটা বড্ড বেশী ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, শাশ্বতী। আমার মামা যে তোমার গুরুজন, তাঁকে একটু মর্যাদা দিলে বিশ্ববিদ্যালয় কি তোমার ছাপগুলো কেড়ে নেবে ?

বিশ্ববিদ্যালয় আমার ছাপ কাড়বে, কি, না কাড়াবে, তা নিয়ে নিশ্চয়ই তোমার মত মূর্খের সঙ্গে 'কনসাল্ট' করতে বসবে না সিণ্ডিকেটের মেম্বাররা—বিষধর সর্পিনীর ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া বলিয়া উঠিল শাশ্বতী।

শাশ্বতীর কাছ থেকে এর মধ্যে এতখানি আঘাত পাইবে বলিয়া অমিতাভ আশা করে নাই। এর উত্তর তাহার কাছে ছিল কিন্তু অমিতাভ বুদ্ধিমান তাই নীরব হইয়াই রহিল।

বিরাট পালঙ্ক। অমিতাভ একটি পাশ লইয়া শুইয়া পড়িল, শাশ্বতী অনেকক্ষণ যাবৎ নীরবে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়া অবশেষে সেই পালঙ্কের অপরপ্রান্তে শুইয়া পড়িল। মাঝখানে পড়িয়া রহিল চওড়া ঘেরের দীর্ঘ পাশ বালিশটি।

হঠাৎ কোথা হইতে কি আসিয়া যেন এই মধুরাতির সমস্ত সুরের তাল কাটিয়া দেয়, সমস্ত ছন্দ যেন কোথায় হারাইয়া যায়। ফুলশয্যার মধুযামিনী এইভাবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে অপঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। জানালার পাশ দিয়া ঝটপট করিতে করিতে একটি কাল-পেঁচাই বোধ করি উড়িয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

(২)

পরেরদিন প্রাতঃকালেই বিয়ে বাড়ীর সবাই উঠিয়াছে। বাড়ীময় পূর্বদিনের ন্যায় হৈ চৈ লাগিয়া গিয়াছে। নূতন বৌএর প্রাতরাশের জন্য কর্তৃমহল ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নূতন বৌকে দেখিয়া সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হইল। শাশ্বতীর মুখ নিরতিশয় গম্ভীর। ফুলশয্যার পরের দিন নূতন বৌ'এর মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তিই সবাই আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্থলে এযে বিষাদের ঘনঘটা! শাশ্বতীর চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল বিগত রাত্রের স্মৃতি মনে করিয়া—তাহার স্বামী বি, এ পাশ নয়! ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছিল তাহার। কিন্তু এইরূপ একটি দৃশ্যের অবতারণা করিলে তাহার মূর্খ স্বামীর কথা পাঁচকান হইবে, তাহার আভিজাত্যপরায়ণ এবং শিক্ষিত পিতার

মাথা হেঁট হইবে—বোধকরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপগুলির নিতান্ত কল্যাণেই এই সব কথা চিন্তা করিয়া শাশ্বতী মুখে কিছু বলে নাই। যাহা করিবে তাহা মনে মনেই ঠিক করিয়া রাখিল।

অপরাহ্নে পিতা আসিতে তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া একশেষ হইয়া শাশ্বতী কহিল, বাবা, একি হ'ল আমার? যার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে সে যে একজন অশিক্ষিত, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট। আমি কি করব আমায় বলে দাও। আত্মীয়স্বজন বন্ধুদের কাছে কি বলে পরিচয় দেওয়া হবে বলে দাও, বাবা, বলে দাও আমায়। তোমায় যা বোঝান হয়েছে সব মিথ্যে।

ভুবনেশ্বর এই খবর শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, তুই শান্ত হ, মা, তুই শান্ত হ, আমি মজা দেখাচ্ছি ঐ স্কাউণ্ড্রেল মামাটাকে—বলিয়া প্রবলবেগে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শশাঙ্কমোহনের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শশাঙ্কমোহন তখন ভিখারী ভোজন করাইতেছিলেন। প্রতিটি ভিখারীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন কাহার কি প্রয়োজন। এমন সময় ভুবনেশ্বর পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন, এই যে, আপনি এখানে, আপনাকে বিশেষ প্রয়োজন। একটা ঘরে চলুন।

শশাঙ্কমোহন তাঁহার স্বাভাবিক বিনীতস্বরে কহিলেন, আরে বেয়াইমশাই যে, চলুন চলুন। বলিয়া বৈঠকখানা ঘরে ভুবনেশ্বরকে লইয়া চলিলেন।

সেই ঘরে ক'য়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল। তাঁহাদের দু'জনকে দেখিয়া তাহারা সেই ঘর ছাড়িয়া অপর একটি ঘরে চলিয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ভুবনেশ্বর প্রবল উষ্মার সহিত কহিলেন, বলি দয়া তো আপনার খুব। আন্তরিকতার সঙ্গে ভিখারী ভোজন করান হ'চ্ছিল। আমার ওপর একটু দয়া করলেই তো পারতেন। অনুগ্রহ ক'রে ভাগনেটিকে গ্র্যাজুয়েট না বললে আমার যে অনেক উপকার হ'ত। এখন আপনার গুণধর ভাগনের কি পরিচয় দেব বলতে পারেন? আপনি একটা স্কাউণ্ড্রেল! আপনাদের কাছে আমার মেয়েকে আমি কিছুতেই রাখতে পারব না।

শশাঙ্কমোহন যেন মাটির সহিত মিশিয়া গেলেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, আজ্ঞে খুব অন্যায় হ'য়ে গেছে। আপনি দয়া করে ক্ষমা করে নিন। তবে আমার ভাগনে বি, এ পাশ না করলেও লেখাপড়া জানে অনেক।

সেই ঘরের সুমুখ দিয়া অমিতাভ যাইতেছিল। মামার প্রতি তাহার শ্বশুর মহাশয়ের এই অশ্লীল তিরস্কার এবং তাহার মামার করুণভাবে ক্ষমা স্বীকারের কথা তাহার কর্ণগোচর হইতেই সে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, উনি আমার মামা, পিতৃতুল্য। আমার পিতামাতাকে আমি জ্ঞানত দেখিনি। ওঁকেই আমি তাই বলে জানি। ওঁকে আপনি ঐভাবে অপমান করবেন না দয়া করে। ওঁর অন্যায় হয়েচে সেকথা আমিও অস্বীকার করচি না। তবে স্কাউণ্ড্রেল ধরণের উক্তিগুলি আপনি অনুগ্রহ ক'রে ব্যবহার না করলে বিশেষভাবে বাধিত হবো। তিন দিনের সম্পর্কের দাবীতে আপনার মেয়ের ভালমন্দের বিচার আমরা করতে পারিনে, আপনার মেয়ের যাতে ভাল হয় তা আপনি করতে পারেন।

আপনার মেয়েকে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। ধরে রাখার অধিকার আমাদের থাকলেও সে অধিকার আমরা খাটাতে যাব না। আপনার যে ক্ষতি হ'য়েচে তার সবটা না পারি অন্তত যতটা পারব তার ক্ষতিপূরণ দোব। আর এতেও যদি আপনার মন না ওঠে তাহলে আদালত আছে সেখান থেকেই ন্যায় বিচারের জন্যে চেষ্টা করতে পারেন।

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেরূপ হয় ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইল শিক্ষা এবং আভিজাত্যের গৌরবে গরীয়ান ভুবনেশ্বর চৌধুরীর। কয়েক মুহূর্ত বাঙ নিষ্পত্তি হয় নাই তাঁহার। তবে ভুবনেশ্বর বিচক্ষণ ব্যক্তি। মনে মনে ভাবিলেন, জেদের মাথায় মেয়েকে এখান থেকে লইয়া গিয়া, না কুমারী, না সধবা, না বিধবা গোছের কিছু একটা করিয়া রাখিলে চারিদিকে ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে। যতই হোক তিনি হিন্দু, দুম করিয়া মেয়ের আর একবার বিয়ে তো দিতে পারেন না। এই সকল দিক ছাড়িয়া দিয়াও তিনি যখন মনে মনে একবার অমিতাভের বেতনের অঙ্কটা স্মরণ করিলেন তখনই তাঁহার কণ্ঠ হইতে যে স্বর নির্গত হইল তা অনেক নিম্ন। তিনি কহিলেন, নিয়ে যান বললেই তো নিয়ে যেতে পারি না, বাবা, আমার মেয়েকে। সত্যি, ঐ ভাবে বেয়াই মশাইকে বলাটা আমার খুব অন্যায় হ'য়ে গেচে। আমি ঐ একরকমের মানুষ বাবা। যাকে নিয়ে তুমি ঘর করবে মা আমার শাশ্বতী, সেই নিষেধ করে দিল এই নিয়ে গণ্ডগোল পাকাতে। আর আমি ঠিক সেই গণ্ডগোলই পাকালুম। শাশ্বতী আমায় বললে, বাবা তোমায় শুধু জানালুম। তুমি কাউকে একথা বল না, সবাইকে বল তোমার জামাই গ্র্যাজুয়েট। শাশ্বতী মা আমার সত্যিই বড় বুদ্ধিমতী।

শশাঙ্কমোহন ভাবে গদ গদ হইয়া কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ! সত্যি বউমা আমার বড় বুদ্ধিমতী, যেমন রূপ, তেমন গুণ। রূপে গুণে মা আমার একেবারে লক্ষ্মী। তাইতো, বেয়াই মশাই, আমি মিথ্যে কথাটা বলতে বাধ্য হলুম, পাছে যদি আবার আমার অমিতাভ বি, এ পাশ না শুনে আপনি আমার কাছে মাকে না দেন। তাই·······তাই, বড় যে লোভ হ'ল আমার।

অমিতাভ আর সেখানে দাঁড়াইল না। ধীরে ধীরে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া একতলার একটি ঘরে আসিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল গতকাল রাত্র হইতে আজ পর্যন্ত যে যে ঘটনাগুলি ঘটিল সেইগুলির কথা।

ভুবনেশ্বর শশাঙ্কমোহনকে খানিকটা তোয়াজ করিয়া শাশ্বতীর কাছে গিয়া শাশ্বতীকে বোঝাইতে লাগিলেন, দেখ মা, তুই আর মন খারাপ করিস নি। জামাই আমাদের খারাপ হয়নি রে। বেশ ভাল রোজগার করে। সবাইকে বললেই হবে—বি, এ পাশ।

পিতার এই কথাটি শাশ্বতীর বেশ মনে ধরে। কহিল, এইটা মন্দ বলনি বাবা। ওঁকে আবার বলে দিতে হবে, সাধু পুরুষ লোকের মত আবার কাউকে বলে না দেন। সত্যি! বাবা, আর কথা বলতেও প্রবৃত্তি হয় না।

ভুবনেশ্বর কন্যাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, আর দুঃখু করিস নি মা, সব কিছুই ভাগ্য বলে মেনে নে। ভাগ্যের ওপর যে কারুর হাত নেই মা। আমরা যতই শিক্ষার দম্ভ ক'রে বলি না কেন যে এই করব তাই করব, যা হবার তা হবেই, ভবিতব্যের কথা কি কেউ বলতে পারে? সত্যি আমার খানিকটা চোখ ফুটল। অমিতাভ গ্র্যাজুয়েট কিনা সে খবরটা আমি নিলুমই না। কারণ আমার মনেও প্রশ্ন কোনদিন জাগেই নি। প্রশ্ন না ওঠারই কথা, অফিসার গ্র্যাজুয়েট হবেই—বরাবর নানান রকম দেখে শুনে এই ধারণাই হ'য়েছিল। কিন্তু অমিতাভের বেলায়ই ঘটল অন্য রকম। মালিকের নেকনজরে পড়ে হ'য়ে গেল পদোন্নতি। তবে হ্যাঁ, ছেলেটার গুণ আছে বলতে হবে, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট হ'য়ে অফিসারের কাজকর্ম ঠিক চালিয়ে যাচ্ছে তো। ছেলেটি খাসা, তবে একটা যা খুঁত রয়ে গেল।

শাশ্বতী হতাশ হইয়া কহিল, ঐ খুঁতেই যে সমাজে অচল হ'য়ে থাকবে চিরকাল, বাবা। সারাটা জীবন ধরে মিথ্যের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে আমার।

ভুবনেশ্বর পুনরায় সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, সব আস্তে আস্তে ঠিক হ'য়ে যাবে মা, তুই কিছু ভাবিস নি।

শাশ্বতী ধুল পা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। মা অনেক বুঝাইয়াছেন, বলিয়াছেন, স্বামী যে সে স্বামীই, শিক্ষিতই হোক আর অশিক্ষিতই হোক, মন প্রাণ সঁপে দিয়ে তার সেবা করবি মা। বড় বোন ব্যারিষ্টার পত্নী তপতী বলিয়াছেন, আহা সত্যি, বড় দুঃখেরই কথা, কিন্তু কি আর করবি বোন, সবই বরাত। এখন যাকে পেয়েচিস তাকেই মনের মতন ক'রে নে, মানুষের মতন ক'রে গড়ে তোল। কাউকে বলতে বারণ ক'রেচেন বাবা, বলব না না-হয় কাউকেই এমন কি তোর জামাইবাবুকেও নয়, তবে ঠিক ক'রে যেন কথাবার্তা বলে দেখিস, কোনখানে যেন নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ না ক'রে ফেলে অমিতাভ। ওগুলো তোর হাতে। ওকে ঠিক ক'রে শিখিয়ে পড়িয়ে নে না। চালাক চতুর আছে এ দিকে। কথা-বার্তাও বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বলে। আমরা তো কেউ ধরতেও পারিনি যে ও গ্র্যাজুয়েট নয়। কথাগুলো শাশ্বতী ভাবে আর মনে মনে দুঃখ পায় যত তত হয় রাগ। আজ যেন ও গোটা-পৃথিবীর সমস্ত লোকের অনুকম্পার পাত্রী। তাহাকে দেখিয়া যেন দুনিয়ার সবাই আহা করিতেছে।

ফুলশয্যার পর হইতে অমিতাভ প্রত্যহ রাত্রের আহার সমাপন করিয়া খাটের একপ্রান্তে শুইয়া পড়ে কোন ক্রমে রাত্রিটুকুকে শেষ করিবার অভিপ্রায়। আজও সে সেইভাবে শুইয়া পড়িল বটে কিন্তু একটু অন্যথা হইল এই রাত্রে। শাশ্বতী আহার সারিয়া আসিয়া অমিতাভের মাথার কাছে। দাঁড়াইতে অমিতাভের তন্দ্রা কাটিল। অমিতাভ শাশ্বতীর দিকে তাকাইতে শাশ্বতী মিহি গলায় কহিল, কাল দিদির মেয়ের জন্মদিন, আশা করি দিদির নেমন্তন্নটার কথা ভুলে যাওয়া হয় নি।

অমিতাভ জানালার দিকে দৃষ্টি স্থানান্তর করিয়া বলিল, মনে আছে।

একটা কথা রাখবে না যুধিষ্ঠিরের নজির দেখাবে—শাশ্বতী সামান্য শ্লেষ করিয়া কহিল। উত্তরে অমিতাভ ধীর ভাবে বলে, এমন কি কথা যার জন্যে ধর্মপুত্রের আশ্রয় নিতে হবে।

—মিথ্যে ক'রে বলতে হবে তুমি গ্র্যাজুয়েট যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে।

—মহাভারতের মত বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারে আমার মত মহা মূর্খের যে

একটুও আশ্রয় মেলেনি, যদি তা মিলত তাহলে হয়ত যুধিষ্ঠিরের মহিমা দেখাতুম। কিন্তু আর পাঁচজনের মত যে সাধারণ জ্ঞানটুকু আমি পেয়েচ তার সৌজন্যেই এইটুকু বলতে পারি যে, যা সত্যি তাকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করতে হয় যার ফলে লাভ করা যায় অনাবিল আনন্দ আর পরিপূর্ণ তৃপ্তি। সত্যের অপলাপ করলে যত না ফাঁকি দেওয়া হয় অন্যকে তার চেয়ে অনেক বেশী ফাঁকি দেওয়া হয় নিজেকে। মিথ্যার ফাঁকা আওয়াজে আমি নিজেকে ফাঁকি দিতে চাই না শাশ্বতী।

শাশ্বতী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিয়া ফেলে, বিষ নেই কুলপানা চক্র!

অমিতাভ সহজ ভাবে কহিল, এইটাই তো ভাল শাশ্বতী, বিষ নেই বলেই তো কুলপানা চক্র ধরতে ভরসা পেয়েচি, যদি থাকত তাহলে হয়তো কুলপানা চক্র ধরতে ঠিক সাহসে কুলত না কারণ সব সময় মনে মনে ভয় থাকত অনিষ্টকারী বিষের ভয়ে ভীত হ'য়ে আবার টপ্ করে প্রাণ নাশ ক'রে ফেলবে না তো।

শাশ্বতী ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, আর সত্যপীর যুধিষ্ঠির সাজতে হবে না, তোমাদের মুখে আর বড় বড় কথা সাজ পায় না। সত্যের যে নমুনা দেখালে।

এ খোঁচা যে শাশ্বতী কি উদ্দেশ করিয়া দিল তাহা অমিতাভের বুঝিতে বাকী থাকে না। তথাপি শান্ত কণ্ঠেই কহিল, এই উদাহরণ থেকেই বুঝে নাও। সত্যকে আড়ালে লুকিয়ে রাখলে ডিনামাইট যেমন পাথরকে ভেঙে চৌচির ক'রে আত্মপ্রকাশ করে তেমনি আত্মপ্রকাশ করে সত্যও সবরকম আড়ালকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে।

শাশ্বতী ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া কহিল, পারবে না তুমি আমার এই কথা রাখতে?

অমিতাভ যেন প্রশান্তিতে গড়া, তাই তো সে প্রশান্ত। কহিল, আমায় ক্ষমা ক'র শাশ্বতী।

শাশ্বতীর চোখ মুখ দিয়া যেন অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়—তাহলে কাল নেমন্তন্ন যাওয়া হবে না?

অমিতাভ বলিল, আমি নাচার।

ছুটি ফুরাইবার দু'ই তিন দিন পূর্বেই অমিতাভ কলিকাতা হইতে কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিল। ভুবনেশ্বর এবং অমলাদেবী অমিতাভকে কোয়ার্টারের

জন্ত বারবার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। শশাঙ্কমোহন বলিয়াছিলেন তবে খুব সংকোচ করিস', কোয়াটারের ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়িই করিস। আমার মায়ের ওপর আবার অভিমান করে থাকিসনি বাবা। মার আমার বয়সটা কম হাজার হোক, তাই এখন তোকে বোধ হয় চিনতে পাচ্চে না। কিছুদিন কাটলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোকে সে একদিন ঠিকই চিনতে পারবে। তোর জ্ঞানের দীপ শিখার তলায় তাকে একদিন এসে দাঁড়াতে হবে বাবা।

আর শাশ্বতী কি বলিয়াছিল? একেবারে যে কিছু বলে নাই তাহা নয়, কিছু নিশ্চয়ই বলিয়াছিল, তবে যাহা বলিয়াছিল তাহা না বলিলেই ভাল ছিল। বলিয়াছিল, হে সত্যের অধিষ্ঠাতা দেব, দয়া ক'রে অচিরেই আমায় কলকাতা থেকে বিহারে নিয়ে গিয়ে অন্তত পুরুষত্বের পরিচয়টা দিও। ছলচাতুরী ক'রে যখন জয়ডঙ্কা বাজিয়ে জয় ক'রে নিয়ে এসেচ তখন শেষটুকু বজায় রেখ। বিয়ে ক'রে বাপের ঘরে ফেলে রেখেচে, পালন করার ক্ষমতা নেই—এরপর যেন এও শুনতে না হয় পাঁচজনের কাছ থেকে; দয়া ক'রে স্মরণ রেখ দাসীর এই কথাটা। দাসীই যখন হয়েচি, দাসত্ব বরণই যখন করেচি তখন নরক ঘাটবার সুযোগ থেকে অনুগ্রহ ক'রে যেন আবার বঞ্চিত ক'র না। মায়ের মুখে শুনেচি, মেয়েছেলের নাকি সংসার নরকই ইন্দ্রের অমরাবতী।

ট্যাক্সি থেকে ট্রেনে, ট্রেন থেকে মেসে অমিতাভ অনেক রকমভাবে চিন্তা করিয়াছে কি তাহার কর্তব্য। সব রকম ক্ষতিপূরণ দিবার জন্ত সে যখন অঙ্গীকারাবদ্ধ তখন সেই অঙ্গীকার রাখাও তাহার দিক দিয়া একান্ত কর্তব্য এবং সে কর্তব্য অপরিহার্য।

কোম্পানীর কর্তৃমহলকে সে জানায় তাহার কোয়ার্টারের প্রয়োজনের কথা। কোম্পানী পনের দিনের মধ্যে দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া দেয়। অমিতাভ মাতুলকে পত্র লিখিলে মাতুল শশাঙ্কমোহন জমিদারের কাজে ইস্তফা দিয়া অনেককালের আশায় ঘর বাঁধিবার জন্ত এবং একাধিকবার স্বপ্নে দেখা সোনার সংসার পাতিবার অভিপ্রায় শাশ্বতীকে লইয়া অমিতাভের নিকট পৌছিলেন।

অমিতাভের কোয়ার্টার দেখিয়া শাশ্বতীর নেহাৎ খারাপ লাগে না। বেশ বড় বড় চারখানি শয়নকক্ষ। ঘরগুলির কোলে সরু বারান্দা। রান্নাঘর এবং ভাঁড়ার ঘরও মনোমত। বাড়ীর সুমুখে ছোট্ট বাগান। বাহিরের ঘরটি বৈঠকখানা হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছে। কয়েকটি সোফা, চেয়ার, টেবিল, ফুলদানি এবং কয়েকখানি অজন্তা পেটার্ণের সুরুচিপূর্ণ ছবির দ্বারা ঘরটিকে

সুসজ্জিত করিয়া অমিতাভ বেশ একটু রুচিরই পরিচয় দিয়াছে। দুইটি শয়ন-কক্ষে দুইটি পালঙ্ক রাখা হইয়াছে। এই দুইটি কক্ষ দুই রকমভাবে সজ্জিত; একটি অমিতাভের মতন করিয়া আর একটি শশাঙ্কমোহনের মতন করিয়া। এই দুইটি ঘর দেখিলে চিনিয়া লওয়া যায় কোনটি কাহার। একটিতে বাঁধান নানানরকম সুঅঙ্কিত ছবি এবং কয়েকজন সাহিত্যিক প্রবরের প্রতিকৃতি। অপরটিতে নানানরকম দেব-দেবী ও ভগবৎ সাধকের ছবি। অমিতাভের ঘর বলিয়া যেটিকে মনে হয় সেটিতে ড্রেসিং টেবিলের উপর একজোড়া সুন্দর ফুলদানি রজনীগন্ধার গুচ্ছে পূর্ণ। একটি দিনরাতের হিন্দুস্থানী চাকর এবং একটি ঠিকা ঝি মোতায়েন হইয়াছে। সব কিছু দেখিয়া শাশ্বতীর সম্ভ্রমও যে একটু জাগিল না, তাহা নয়। অমিতাভ প্রকৃতই অফিসার কিনা এ সম্বন্ধে শাশ্বতীর মনের কোণে একটু সন্দেহ উঁকি দিয়াছিল বৈকি, তবে এইসব দেখিয়া-শুনিয়া এইবার সে সন্দেহের নিরসন হয়। শাশ্বতী মনে মনে ভাবে—অমিতাভ এই ক'দিনের ভিতরেই ত বেশ গোছগাছ করিয়াছে। কিন্তু এসব কিসের জন্য? কাহার জন্য? উদ্দেশ্য তো সেই। তাহারই একটুখানি অনুরাগ পাইবার লোভে এই রুচিবোধের পরিচয় প্রদান। শাশ্বতীর অনুকম্পাই হয়। সেই প্রথম কথা বলে, এই অল্প ক'দিনের ভেতর বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েচ তো, দেখচি। আমার জন্যে একটি কাজও তো রাখনি।

—রাখতে তো তুমি বলনি শাশ্বতী।

—এ আবার বলতে হয় নাকি, বুঝে নেয়া উচিত তো।

—বোঝার সুযোগ তো আমায় দেওয়া হয়নি শাশ্বতী।

—সুযোগ কি কেউ কখনো কাউকে দেয়। সুযোগ ক'রে নিতে হয়।

—বাবা, এতো কঠিন কাজ। তাহলে তো আবার বিদ্যের প্রশ্ন ওঠে। এ রকম ধরণের সুযোগ করতে হলে মনস্তত্ত্ব বিদ্যায় যে সবিশেষ পারদর্শিতার প্রয়োজন। আমার মতন মূর্খ তো ঐখানে অসহায় শুধু অসহায় নয় একেবারে অসহায়া নারী।

ইহা যে প্রকৃত বিনয় একথা শাশ্বতী বুঝিল না, বিদ্যার ব্যাপারে অমিতাভের এই দুর্বলতা প্রকাশ শাশ্বতীর মনকে পীড়া দেয়। শাশ্বতী কহিল, কোন বিষয় দক্ষতা থাকলে তবেই বিনয় করলে শোভা পায় এবং সেই বিনতা সার্থক ও সমীচীন হয়। নচেৎ ঐ বিনয় যে দম্ভেরই নামান্তর তা আর বুঝতে কারুরই বাকী থাকে না।

অমিতাভ স্মিতহাস্যে কহিল, আমি যদি বলি ঐ বোঝা ভুল বোঝা, যার সম্বন্ধে ঐ রকম বোঝা হয় তার উপর যে মিথ্যা বোঝা চাপান হয়। বিজ্ঞতা প্রকাশ করলে জানি দম্ভ করা হয় কিন্তু অজ্ঞতা প্রকাশও যদি দম্ভের নামান্তর হয় তাহলে তো সবরকম প্রকাশকেই মূক হয়ে থাকতে হয়।

এই রকম কথা কাটাকাটির মধ্যেই দিন কাটে। যখন শাশ্বতীর অমিতাভের সান্নিধ্য লাভের বাসনা জাগে তখন অমিতাভের উদাসীনতা তাহাকে ক্ষান্ত করে; সুপ্ত বাসনা তাহার হৃদপিণ্ডে অব্যক্ত যাতনায় আছাড় খাইয়া মরে। পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায় এই কারণে নীরবতার কোলেই মাথা রাখে শাশ্বতী।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া অমিতাভ কি সব লেখে। শাশ্বতী ঘুমের ভাণ করিয়া বিছানায় পড়িয়া থাকে। সে যে জাগিয়া থাকে একথা অমিতাভকে কোনদিন বুঝিবার অবকাশ দেয় না। অমিতাভের শুইতে ১টা ২টা বাজিয়া যায়, নির্লিপ্তের মত আলো নিভাইয়া বিছানার এক পাশটিতে শুইয়া পড়ে।

অনেক বিনিদ্র যামিনী পার হয় শাশ্বতীর, অমিতাভের মুখের দিকে চাহিয়া শাশ্বতী ঠায় বসিয়া থাকে। অনেক কথাই সে মনে মনে ভাবে। অন্তরে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলে। সে কি পরাজয় স্বীকার করিবে? মায়ের কথা মনে হয়—স্বামী যে সে স্বামীই, শিক্ষিতই হোক আর অশিক্ষিত হোক, মন প্রাণ সঁপে দিয়ে সেবা করবি মা। তাহার সহোদরা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন—আহা সত্যি বড় দুঃখেরই কথা কিন্তু কি করবি বোন, সবই বরাত। এখন যাকে পেয়েছিস তাকেই মনের মত করে নে, মানুষের মতন করে গড়ে তোল। সে এবং তাহার স্বামী যে সকলেব অনুকম্পার বস্তু! কিন্তু কেন? এই অসহায়তার তো কোন কারণ নাই। তাহার স্বামী তো অপদার্থ নয়। বিদ্যাও তো তাহার কিছু কম নাই। তবে কেন অমিতাভ এত অসহায়? অমিতাভের স্ত্রী বলিয়া তাহারই বা কিসের আক্ষেপ? কিন্তু তবুও ঐ 'তথাপি'। অমিতাভের কাছে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না। ইতস্ততের দোলায় কেবলই দুলিতে থাকে।

দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া যায়। কাক ডাকিয়া ওঠে। নূতন উষার কনকরেখা চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়।

মাস দুই অতিক্রান্ত হইল। বিপর্যয় ঘনাইয়া আসে। শশাঙ্কমোহন স্নানের জন্য স্নানাগারে গিয়া আর বাহির হইলেন না। একঘণ্টা পরে দরজা অনেক ঠেলাঠেলি করিয়াও যখন কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তখন দরজা ভাঙ্গিয়া দেখা গেল শশাঙ্কমোহন অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছেন।

ডাক্তার আসিয়া জানাইলেন, করোনারি থ্রম্বসিস। অতএব বাঁচনোও দুষ্কর হইল। ঘণ্টা দু'একের মধ্যেই শশাঙ্কমোহন সোনার সংসার ভোগ করার অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পরপারে যাত্রা করিলেন। অমিতাভ এবং শাশ্বতীর মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা যে বিরাট সে কথা শশাঙ্কমোহন বেশ ভালভাবেই বুঝিতেন। অমিতাভের জীবনের জন্য তিনিই যে দায়ী একথা অহরহ ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার শরীর দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। অমিতাভকে উপদেশ দেওয়ার মত কোন ভাষাই তিনিই খুঁজিয়া পান নাই।

অমিতাভ পিতৃবিয়োগ ব্যথাই অনুভব করে। তাহার পিতৃতুল্য মাতুল যে শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন নাই, অনেক দুঃখ লইয়াই যে তাঁহাকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে তাহা অমিতাভের অজানা নয়।

মৃত্যুকে সবাই সহানুভূতি করে। শশাঙ্কমোহনের মৃত্যুতে শাশ্বতী অমিতাভের পাশে দাঁড়াইতে চেষ্টা করে। সময় সময় যে কৃতকার্য হয় না এমন নয়। তবে একমাস যাইতে না যাইতে আর এক বিপর্যয়ের ফলে সবকিছু যেন তালগোল পাকাইয়া যায়।

অকস্মাৎ অমিতাভ চাকুরী হইতে বরখাস্ত হইল। চাকুরী যাওয়ার কারণ সজ্জনপ্রীত যাহার ইংরাজী করিলে দাঁড়ায় 'নেপটিজম'। অমিতাভের ঠিক ওপরওয়ালা অর্থাৎ 'বস' মালিকের নিকট ইনিয়ে বিনিয়ে প্রার্থনা করে যে তাহার সম্বন্ধী সম্প্রতি এম, এ পাশ করিয়া বসিয়া আছে—যদি দয়া করিয়া অমিতাভের স্থলে তাহাকে একটি 'চান্স' দেওয়া হয়—। তাহার সম্বন্ধী যখন এম,এ তখন নিশ্চই সে অমিতাভ অপেক্ষা ভাল কাজ করিবে—ইত্যাদি বলিয়া তিনি মালিকের কানে বিষ ঢালিলেন। মালিকের কর্ণ কুহরে সে বিষের প্রতিক্রিয়া অনতিবিলম্বেই সুরু হয়। খোসামদপ্রিয়তা, কানপাতলাম প্রভৃতি যে সমস্ত গুণাবলী ধনীসম্প্রদায়ের মজ্জাগত সেই সকল গুণাবলীর অধিকার হইতে এই সওদাগরী অফিসের বিত্তবান মালিকটিও বঞ্চিত হন নাই। অতএব, অমিতাভের চাকুরী আর কি করিয়া টেঁকে!

বলাবাহুল্য শাশ্বতীর মত স্ত্রী নিশ্চয়ই অমিতাভের পাশে দাঁড়াইয়া অমিতাভের উসকো-খুসকো কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলে নাই, চাকরী গেছে তো হ'য়েচেটা কি? ভাবনা কি? একটা গেছে আর একটা আসবে। আর যদি নাও আসে, দুঃখ কি? দু'টো তো পেট। ঠিক চলে যাবে।

আপাততঃ আমার যা গয়না আছে তা দিয়ে বেশ কিছুদিন চলবে'খন। তাহা নিশ্চয়ই শাশ্বতী বলে নাই। তাহার স্থলে ইহা বলাই শাশ্বতীর পক্ষে স্বাভাবিক, অনেক হয়েচে। এখন আমায় ধর্মে ধর্মে আমার বাবার কাছে দিয়ে এসো।

অমিতাভ নির্লিপ্তের মত তাহাই করিয়াছিল। শশুরালয়ের দরজায় সে নিজে পা দেয় নাই। ট্যাক্সি হইতে শাশ্বতীকে নামাইয়া দিয়া সেই ট্যাক্সি করিয়াই কলিকাতার কোন একটি মধ্যম শ্রেণীর মেসে অমিতাভ উঠিয়াছিল। উদয় অস্ত চাকুরীর সন্ধান করিতে থাকে অমিতাভ। অমিতাভ চিন্তা করিল লেখালেখির দিকেই তাহার আগ্রহ সর্বাধিক। আর তাছাড়া তার পিতার শেষ ইচ্ছা ছিল, সে যেন একজন লেখক হয়। পিতৃবাসনা এবং নিজের আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিবার মানসে অমিতাভ বাহির হয়। ইংরাজ রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে অমিতাভের পিতামহ সাংবাদিকতা করিতেন। বলিষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আজও চারিদিকে প্রণম্য। পিতামহের নাম সম্বল করিয়া প্রতিটি সংবাদপত্রের মালিকের কাছে গিয়া ধর্ণা দেয়। অমিতাভ প্রথমে খাতিরই পাইয়াছিল সব জায়গায় কিন্তু চাকুরীর কথা পাড়িতেই মালিকের তরফ হইতে গম্ভীর প্রশ্ন আসিয়াছিল—কি পাশ ?

উত্তরে অমিতাভ সবিনয়ে জানাইয়াছিল, আজ্ঞে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ তো একটাই করেচি, তবে লেখার দিকে খুবই ঝোঁক। কিছু কিছু লেখাও কতকগুলি পত্র পত্রিকায় বেরিয়েচে, আমি কাজ ঠিকই করতে পারব। শুধু আমায় একটা সুযোগ দয়া করে দিন।

আজকাল অন্ততপক্ষে গ্র্যাজুয়েট না হ'লে সাংবাদিক হওয়া যায় না— সকলের মুখে একই উত্তর।

একে একে সকলের কাছ থেকে অমিতাভ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অবশেষে সংবাদপত্রের কর্মখালি বিজ্ঞাপন মারফৎ অতিকষ্টে যে চাকুরীটি অমিতাভ জুটাইয়াছিল সেটি একটি কেরাণীর পদ।

(৩)

এদিকে শাশ্বতী পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সবাই বিস্মিত হয়। যথাসময় সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রতিটি লোকের দুঃখ প্রকাশের আর অন্ত থাকে না। দুঃখ এবং লজ্জা শাশ্বতীকে অহরহ ঘিরিয়া থাকে। তাহার

কপালে এতও লেখা ছিল! শাশ্বতীর মা কিন্তু একালের নয়, পুরামাত্রায় সেকেলে। তিনি শাশ্বতীকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করেন, হাজার হোক স্বামী যে মা। স্বামী ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করলে স্ত্রীরও কর্তব্য স্বামীর পাশে ভিখারিণী হয়ে দাঁড়ান। ছিঃ মা, কাজটা কি ভাল করলি। এই বিপদের দিনে স্বামীর পাশ থেকে এইভাবে সরে দাঁড়ান কি উচিত হ'ল। লেখাপড়া শিখেচিস্, তোরা তো আরও বেশী বুঝবি। শাশ্বতী বলিয়াছিল, মা তুমি আমায় বোঝাতে এসনা। তুমি ঠিক বুঝবে না আমার অবস্থা। তোমরা কেন আমায় তাহলে সেইভাবে মানুষ করনি। আজ এসেচ জ্ঞান দিতে।

পেটের একটা যা হোক ব্যবস্থা করিয়া অমিতাভ লেখায় মন দেয়। সম্প্রতি সে একখানা উপন্যাসে হাত দিয়াছে। অফিস হইতে ফিরিয়া সেই যে নিজের কামরার দোরে খিল দেয় সেই খিল একেবারে খোলে সকাল আটটায়। মাঝে শুধু একবার মেসের ভৃত্য আসিয়া রাত্রের খাবার রাখিবার জন্য দ্বারে করাঘাত করিয়া বিরক্ত করিয়া যায় এবং ৫।৬ ঘণ্টা ঘুমের কল্যাণে না রাখিলে নয় তাই রাখিতে হয়। অমিতাভ পূর্বে যে ছদ্মনামে লিখিত আজকাল আর সেই ছদ্মনামে লেখে না। তাহারই বাল্যবন্ধু অধ্যাপক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামেই এখন সে মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া থাকে। অমরনাথ এত বড় একটা মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইতে রাজী হয় নাই, কিন্তু অমিতাভের প্রখর ব্যক্তিত্বের অনুরোধে শেষটায় রাজীই হইয়াছিল, বলিয়াছিল, আমি হ'চ্চি অঙ্কের অধ্যাপক আমি সাহিত্য করচি একথা একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও যে কেউ বিশ্বাস করবে না অমিতাভ।

উত্তরে অমিতাভ বলিয়াছিল, স্যার জগদীশের উদাহরণটা তাদের দিয়ে দিস। বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের জোড়া মুকুটের ভার তিনিও যখন সইতে পেরেছিলেন তখন তুইও না হয় বন্ধুর সৌজন্যে অঙ্কের এবং সাহিত্যের জোড়া মুকুট বহনই না-হয় একটু করলি।

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর হইতে লেখার জন্য আবেদন না হইলেও অনুরোধ আসিতেছে। বলাবাহুল্য রচনার বৈশিষ্ট্য হিসাবে লেখকের যাহা পাওয়া উচিৎ লেখক তাহা মোটেই পায় না কারণ লেখক নবীন। তবে রচনাগুলি প্রকাশ করিয়া পত্র-পত্রিকার কর্তৃমহল লেখককে যে 'চান্স' দিতেছেন একথা অনস্বীকার্য। অখ্যাত লেখকের রচনা সম্পাদকমণ্ডলী পাওয়ামাত্র সাধারণতঃ যেভাবে

'ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট'-এ ফেলিয়া দেন এ ক্ষেত্রে তাহার ব্যতিক্রম ঘটে বৈকি। তবে ব্যতিক্রম ঘটিবার প্রধানতম কারণটি হইতেছে লেখকদের নামের পূর্বে অধ্যাপক শব্দটির সংযোজনা। শিক্ষাপ্রাপ্তের এই উজ্জ্বল ছাপটির কল্যাণে স্বভাবতঃই সম্পাদকগণ কৌতূহলবশতঃ অমিতাভের রচনার ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য সচেষ্ট হন এবং শেষ পর্যন্ত সবটাই পড়িতে বাধ্য হন তো বটেই উপরন্তু পাঠান্তে সেটির উপর 'অবশ্য' নোট দিয়া যত্নসহকারে 'মনোনীত রচনার ফাইল'এ রাখিবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু লেখককে যে সুরে মনোনয়নপত্র দেন তা মোটেই উচ্ছ্বসিত নয় কারণ লেখকের রচনা ভাল বলিলেই লেখকের দর বাড়িয়া তো যাইবেই মাথায়ও চড়িয়া বসিতে পারে লেখক। সেই কারণে অমরনাথের কাছে বিভিন্নপত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তর হইতে যেসব রচনা মনোনয়নপত্র আসে সেইগুলির প্রায় প্রতিটির ভাব একই রূপ—আপনার লেখা মনোনীত করিয়া আপনাকে একটী সুযোগ প্রদান করা হইল। আপনি অধ্যাপক মানুষ চেষ্টা করিলে আরো ভালো লিখিতে পারেন। এ লেখা এই সংখ্যায় যাইবে। পরবর্তী সংখ্যার জন্য আর একটা লেখা পাঠাইতে পারেন। অমরনাথ সেইসব চিঠিপত্র লইয়া অমিতাভের সহিত দেখা করে। অমিতাভ সেগুলি পড়িয়া মৃদু হাসে। অমরনাথ বলে,, দেখেছিস অমিতাভ, তবুও হতভাগা সম্পাদকের দল কিছুতেই সোজা কথায় ভাল বলে স্বীকার করবে না তোর লেখাগুলোর। বাঙালী জাতটাই এই রকম, কখনও 'এপ্রিসিয়েট' করতে জানে না। জানে শুধু পরের ছিদ্র দেখে বেড়াতে।

অমিতাভ স্মিত হাস্যে বলে, বাঙালী জাতটার ঐ ভাবে অপরাধ নিসনি ভাই! এই জাতের অন্তর্ভূক্ত রবীন্দ্রনাথই যখন একধার থেকে সবাইএর ভূমিকাতেই লেখককে প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছিলেন সেই সময় একজনের প্রতিবাদের উত্তরে বলেছিলেন, ভাল না-হয় নাই বললাম তবে খারাপই বা বলব কেন? ভাল করতে পারব না বলে মন্দ করব?

অমরনাথ বলিল, মনীষীর উদাহরণ টানলি কেন? মনীষীর কথা তো আমি বলিনি?

উত্তরে অমিতাভ কহিল, কিন্তু অমরনাথ, মনীষীরাই তো আমাদের আদর্শ।

অমরনাথ বলিল, আরে বাবা, আমি তা বলচিনা, আমি আদর্শ পথ প্রদর্শক এ সবের কথা বলতে চাইনা, আমি বলচি সাধারণ লোকের কথা, যাদের নিয়ে আমাদের কাজ কারবার।

অমিতাভ কহিল, সাধারণ লোক 'এপ্রিসিয়েশনে'র কি বুঝবে বল? আর বুঝলেও এর সার্থকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত তলিয়ে বোঝার সাধ্যি কার আছে? এ শুধু আমাদের বাঙালী জাত কেন, পৃথিবীর কোন জাতের মধ্যে এই 'কমপ্লেক্সিটি'র লোকের অভাব দেখতে পাবিনে। অভাব যদি সত্যিই থাকত তাহলে বারনার্ড শ'র লেখা প্রকাশকেরা প্রথমে ছাপতে অরাজী হ'ত না।

কথাটা কিছুক্ষণ ভাবিয়া অমরনাথ বলিল, তা বটে। তবে আমি যে শ্রেণীর লোকের কথা বলচি সে শ্রেণীর লোক আমাদের দেশে বেশী কিনা বল্?

ইহার উত্তরে অমিতাভ কহিল, সে কথাটা না হয় আমি স্বীকার ক'রে নিতে রাজী আছি। তবে তার কারণও আছে যথেষ্ট। আমাদের দেশের লোকে শিক্ষার সুযোগ পায় কতটুকু। লেখাপড়া যেটুকু শেখে তা অল্প বিদ্যে ভয়ঙ্করী গোছের হ'য়ে ওঠে। আর বড় বড় শিক্ষাবিদ্‌গণের মাথায় নিয়তই জিলিপির প্যাঁচ পাক খাচ্ছে! দোষটা জাতের নয়, দোষটা সমাজের।

সেটা কি রকম হ'ল? সমাজ তো জাতিরই সৃষ্টি—অমরনাথের মুখে বিস্ময়।

—হ্যাঁ জাতিরই সৃষ্টি সমাজ ঠিকই। তবে কি জাতির সৃষ্টি সেটাই দেখতে হবে। জাত সৃষ্টির আগে তার সমাজটি ঠিকই তৈরী হ'য়ে থাকে—ইতিহাসে এর নজির পাওয়া যায় বৈকি অমরনাথ। জাতটা প্রতিপালিত হয় সেই সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। একটা জাত তৈরী হয় আর একটা জাত থেকে। যে সমস্ত দেশের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হয় সেই সমস্ত দেশ মনের মতন ক'রে তাদের সমাজ গড়ে নেয়, তাতে যদি প্রচলিত সমাজের সংস্কারের দরকার হয় তাহলে সে সংস্কার সাধন সে দেশ করে। শুধু সংস্কার কেন প্রয়োজনবোধে সেই প্রগতিবাদী দেশ সেই জরাজীর্ণ ঘুণধরা সমাজের বিনাশ সাধন ক'রে নূতন ক'রে নূতন ভাবে সমাজ গঠন করে। বাঙলা দেশের কি সেইভাবে বিপ্লবাত্মক উত্থান হয়েচে যে তার অভ্যুদয় হবে। সামাজিক পঙ্কিলতার আবর্তনে বাঙলা দেশটা নাকানি চোবানি খাচ্ছে যে ভাই, তাই তো বাঙালী জাতির এত খোয়ার!

ঘড়ি অমরনাথের কলেজ এবং অমিতাভের অফিসের সময় ইঙ্গিত করিলে সেদিনের মত আলোচনা এইখানেই স্থগিত থাকে।

একদিন বাল্যবন্ধু অনিমেষের সহিত অমিতাভের রাস্তায় দেখা হইয়া যায়। দীর্ঘদিন বিরতির পর তাহাদের এই দেখা। অনিমেষ তাহার হোষ্টেলে অমিতাভকে লইয়া চলিল। অমিতাভকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে

অনিমেষ বলিয়া ওঠে, দৈব ঘটনাই একদিন তোকে ও আমাকে আলাদা করে দিয়েছিল, আজ আবার সেই এক ক'রে দিল। ভগবান আমি মানি নে অমিতাভ, কিন্তু প্রকৃতির লীলা খেলাকে আমি স্বীকার করি। সেই যে বিহারে চাকরী নিয়ে চলে গেলি তারপর এই দেখা। এর ভেতর আমার এম, এস-সির খবর বেরুবার পর পর্যন্ত ঠিকমত চিঠির আদান প্রদান হয়েছিল, ঝরিয়ায় আমি চাকরী নিয়ে চলে যাবার পরও তোর আমার ভেতর চিঠির দেওয়া নেওয়াটা বন্ধ হয়নি, কিন্তু আসানসোলে বদলি হ'য়ে যাওয়ার পর থেকে প্র্যাকটিক্যালি তোর সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগই নেই। চিঠি লিখবই বা কি ক'রে একটা মেয়ের সঙ্গে যে ব্যাপারই হ'ল!

অমিতাভ সেই প্রসঙ্গ চাপা দিয়া কহিল, ওসব কথা থাক, অনিমেষ। সেই কয়লার খনিতেই এখন আচিস তো? বিয়ে থা করলি নাকি?

অনিমেষ হাসিতে হাসিতে কহিল, আসানসোলে বদলি হ'তে ওখানকার ম্যানেজারের মেয়ে নর্মদার সঙ্গে আমার ভালবাসা হ'ল। নর্মদা বিয়ের প্রশ্ন তুলল কিন্তু তার বাবা আমি অব্রাহ্মণ বলে আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হ'লেন না। তারপরেই নাটকীয় ব্যাপার! নর্মদা একদিন রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে এল আমার কাছে, তাকে বিয়ে করার জন্যে কাতর অনুরোধ জানালে আমায়। জানিস তো, চিরদিনই আমি এ্যাডভেঞ্চার, রোমান্স এইগুলোকে ভালবাসি। রোমান্সের কাছে—অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাকে তুচ্ছ বলে মনে করি। মায়ের বয়স হ'য়েচে একলা একলা দেশে থাকেন। সংসার পাতবার ইচ্ছে হ'ল। কলকাতায় মা বউকে নিয়ে সংসার করা যাবে, চাকরীও কি কলকাতায় একটা জুটবে না—মনে মনে ভাবলাম। রাজীই হ'য়ে গেলাম। এর আগে, তোকে তো বলেচি অনেক, তুই তো জানিস, বহু মেয়ের সঙ্গেই মেলামেশা ক'রেচি কিন্তু বিয়ের প্রশ্নটা এমন ক'রে কখনও এসে থমকে দাঁড়ায়নি। তাই আর অমত করিনি। মেয়েটিও সুশ্রী, লাবণ্যভরা, সরল। ওখানে থাকা আর মোটেই সম্ভব নয়। তাই চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম কলকাতায়।—বিয়ে করলাম নর্মদাকে। স্ত্রীভাগ্যে চাকরীও মিলল কলকাতায় একটা। পদার্থ বিদ্যার গবেষণাগারে।—শ্বশুরমশাই অনেক খুঁজে পেতে বার করলেন আমাদের। এরপর মেয়ে জামাইএর সঙ্গে মিলনান্ত দৃশ্যের অবতারণা! উপস্থিত আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা হোষ্টেলে আছি। বিয়ে করলুম থা করলুম অথচ হোষ্টেলে আছি কেন, আশ্চর্য হচ্ছিস, না? দূর, বউ নিয়ে

এক ঘেয়ে জীবন ভাল লাগে না, না আছে বৈচিত্র্য না আছে আনন্দের মানচিত্র। মোদ্দা কথা সুখ পেয়েও পাচ্ছি না। বউকে একটা ছল করে তার পিত্রালয়ে রেখে এসেচি। মাকে আবার দেশে রেখে এসেচি। অবশ্য মাঝে মাঝে যাই। কলিকাতায় নর্মদা একটা বাড়ীর ব্যবস্থা দেখতে বললে বলি, পাচ্ছি না। আসলে বাড়ী অনেকই পাই কিন্তু এখানে বউকে নিয়ে এলে বউ আর ভাতের হাঁড়ি ছাড়া কিছুই হবে না। চিরকেলে অভ্যেসের ফুর্তিটা একেবারে মাটি হ'য়ে যাবে।

অমিতাভ ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, বিয়ে ক'রে সুখী নস্ কেন?

অনিমেষ সহজভাবে উত্তর করিল, নিজের দোষে সুখী হ'তে পারিনি। যৌবনের আরম্ভে কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত হ'য়ে যে আগুন নিয়ে খেলা করেচি, সেই আগুনেই আজ দগ্ধ হ'তে হচ্ছে, পুড়ে ঝলসে মরতে হ'চ্ছে আজ। পরিণামে যে এত জ্বালা তা যদি তখন বুঝতুম তাহলে হয়তো ও খেলায় মত্ত হতুম না সেদিন।

অনিমেষের হোষ্টেল আসিয়া পড়ে। অনিমেষ অমিতাভকে চা জলপান দ্বারা আপ্যায়ন করে। অমিতাভ অনিমেষের কথাগুলো শুনিয়া প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, যৌবনের প্ররোচনায় ভোগটাকেই বড় ক'রে দেখেছিলি, অনিমেষ। নারীকে শুধু জেনেছিলি ভোগের সামগ্রী বলে। সুযোগ পেলেই লোভাতুরের মত তাকে ব্যবহার করতে কুসুর করিসনি। তোর চিঠিগুলো পেয়ে আমি ভয় পেতুম। ঠিক এই রকমই একটা কিছু হবে তা আমি তখন আশঙ্কা করেছিলুম। বেশী কিছু তোকে বলতে পারিনি—কারণ আমি জানতাম তুই ছুটেচিস আলেয়ার পেছুনে, বলে তোকে কিছু হবে না।

অনিমেষ অনুশোচনার চাপা বেদনা লইয়া কহিল, তুই ঠিকই বলেচিস অমিতাভ, সুযোগ পেলেই লোভাতুরের মত তাকে ব্যবহার করতে কসুর করিনি। এককে ফেলে আর এককে ধরতুম, নূতনকে যে বড্ড বেশী ভালবাসতাম কিনা! তুফান হাওয়ার মত ভোগ আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত, উচ্ছৃঙ্খলতার চরম ধাপে দাঁড়িয়ে ওমর খৈয়ামের গান গাইতাম বিকৃত কণ্ঠে—

সেই তো সখি মাটির কোলে
হবেই শেষে পড়তে ঢলে
তাই বলি—আয়, হিম-অতলে তলিয়ে যাওয়ার আগে—
ভোগ ক'রে যাই প্রাণটা হেসে,
বুক ভ'রে নিই ভালবেসে।
এই জীবনের যে-কটা দিন সামনে আজও জাগে!

অমিতাভ কহিল, সেই ভোগের ভেতর গা ভাসিয়ে দিয়ে কি পরিমাণ ক্ষতির বোঝা ঘাড়ে নিয়েচিস, বলতো ? ওমরের ভাষায়ই বলচি,

করেছিল পূর্ণপাত্র সবাই সেদিন পান ;

নেশায় অবশ অংগ তাদের আজ পড়েছে ঢলে

একে একে ধরার বুকে শেষ বিরামের কোলে !

উপচয়ের থেকে অপচয় বেশী হ'লেই রিক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হয়, অনিমেষ। অনেক মেয়েরই সংস্পর্শে এসেচিস জীবনে কিন্তু নর্মদার কাছ থেকে ছাড়া লাভ ক'রতে পারিস নি অন্য কাউর কাছ থেকে কিছুই বরঞ্চ ক্ষতির বোঝাই ক্রমশঃ বেড়ে গিয়েছে। জীবনের একটা বিরাট অংশ শুধু ক্ষয়ই হ'য়েছে বিনিময় অক্ষয় হ'য়ে থাকেনি কোন কিছু। অপচয়ই হ'য়েছে, উপচয় হয়নি কিছুই। তবে হ্যাঁ, অভিজ্ঞতার মূল্যটা বড় কম নয়। যে ক'জন মেয়ে তোর জীবনে এসেচে তাদের ভেতর লক্ষ্য ক'রেচিস শূন্যতাই বেশী। তোকে পাওয়ার জন্যে মেয়েগুলোর কি আকুলতা! তাদের ব্যাকুলতা দেখে তুই হেসেচিস। টেনিশনের মত ছিল,—পুরুষ শিকারী, মেয়েরা শিকার। কিন্তু তোর জীবন সংজ্ঞা দিচ্চে বারনার্ড'শর অভিমতের। শ' টেনিশনের ঠিক বিপরীত কথাটা বলতেন। তিন বলতেন, সৃষ্টি বাঁচিয়ে রাখবার তীব্র বাসনা রয়েছে নারী দেহের রক্তে। তাই তারা নানা কৌশলে আকৃষ্ট করে পুরুষকে প্রকৃতির বিধানে। তাদের কাছে পুরুষ সৃষ্টি রক্ষার যন্ত্র মাত্র। পুরুষের প্রয়োজন মেয়েদের কাছে শুধু ঐটুকু। বারনার্ডশর মতে, এই তত্ত্বের দৃষ্টান্ত প্রাণী জগত। মিলনের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী মাকড়সা পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে, পুরুষ মৌমাছি মিলনের পরেই আর বেঁচে থাকতে পারে না, তার জন্যে স্ত্রী মৌমাছির কোন ক্ষতি হয় না। সঙ্গীত সে থামায় না। সুরের তাল তার কাটে না। তোর ক্ষেত্রেও দেখ্, তারা যা চেয়েছে তুই দিয়েচিস তা তাদের. বঞ্চিত করিস নি তাদের, মালা হাতে যারা এসেছিল, যারা তোর কাছে আবেদন জানিয়েছিল—আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার, ফিরিয়ে দিসনি তুই তাদের। উদারতা আছে বৈকি তোর, অনিমেষ। কিন্তু এই উদারতা দেখাতে গিয়ে তোর জীবন হ'য়েছে গ্লানিময়, আত্মা হ'য়েছে কালিমাময়, কলুষিত হ'য়েছে তোর হৃদয়, ফাটল ধরেচে তোর মন-মন্দিরে।

অনিমেষ নিজেকে হাল্কা করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এক কথায় যা

বললে দাঁড়ায়—সেদিনের সেই অভ্যাস ছাড়তে পারিনি বলে ভোগের চেয়ে দুর্ভোগই জুটচে আজ অনেক বেশী ক'রে, এই তো!

অমিতাভ মৃদু হাসিয়া বলে, দেখা যাক শার্লটের মত কোন মহিলা তোর জীবনে এসে বারনার্ড'শ মতকে ঘুরিয়ে দিয়ে আবার টেনিশনের মত প্রতিষ্ঠা করে কিনা। অনিমেষ কৌতূহলী হইয়া অমিতাভের দিকে চাহিয়া থাকে। অমিতাভ বলিয়া চলে, কখনো শ'র সঙ্গে দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হবেন না এই শপথ নিয়ে শার্লট শ'র সঙ্গে মিলতে রাজী হ'য়েছিলেন। এই অদ্ভুত দাম্পত্য জীবনে কিন্তু প্রেমের এতটুকু অভাব ছিল না। অনেকে তাঁদের এই অস্বাভাবিক ভালবাসা দেখে আশ্চর্য হ'তেন বৈকি। শ'র মনের খানিক জায়গা রিক্ত হ'তে বসেছিল, তাই সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্যে কখনো-কখনো অন্য মেয়ের সান্নিধ্য লাভ ক'রতে বাসনা করতেন। কিন্তু শার্লট যাকে বলে নট নড়ন চড়ন!

তারপর অমিতাভ পুনরায় প্রশ্ন করে, সন্তান-সন্ততি হয়েছে?

অনিমেষ নির্বিকারভাবে উত্তর দেয়, হ্যাঁ একটি ছেলে হ'য়েচে।

অতঃপর অনিমেষ সহাস্যে কহিল, আমার কথা তো জানা হ'ল এখন তোর কথা বল্? ছুটিতে কি কলকাতায় এসেচিস? বিয়ে-টিয়ে ক'রেচিস? নির্লিপ্তের মত অমিতাভ বলে, একেবারে ছুটি ক'রে এসেচি কলকাতায় অর্থাৎ চাকরী আমার গেছে। বিয়ে আমারও হ'য়েছে, ভাই। তবে আমি আমার স্ত্রীর যোগ্য নই বলে তিনি বাপের বাড়ী চলে গেছেন। অনিমেষ স্তব্ধ হইয়া যায়। ইহার পর নীরবতা আসিয়া ঠায় বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। কিছু খুচরো আলাপের পর অমিতাভ উঠিয়া পড়ে।

(৪)

একদিন সকালে অনিমেষ তাহার এক বন্ধুর বাড়ী গল্পগুজব করিয়া বাহির হইতে যাইবে এমন সময় দেখিল একজন সুন্দরী তন্বী সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে। কিছুক্ষণ অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া অনিমেষ অবাক বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আরে শাশ্বতী দেবী যে! কি খবর? চিনতে পারেন?

যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল সে অনিমেষের দিকে তাকাইয়া বিস্মিত

হইয়া কহিল, আরে অনেকদিন পরে আপনাকে দেখচি যে, কি খবর, ভাল তো? এখানে?

অনিমেষ সহাস্যে কহিল, এটা আমার এক বন্ধুর বাড়ী। আপনি এখানে?

—এ বাড়ীর একটি ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্রীকে আমি পড়াই।

—দাঁড়ান দাঁড়ান, আমায় একটু সময় দিন বুঝতে। মানে বিত্তবান এবং বিভববান শ্রীভুবনেশ্বর চৌধুরীর কন্যা হ'য়ে আপনি প্রাইভেট টিউশানি কচ্চেন! ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না তো!

—চুপ! কেউ জানে না আমি এত বড় একজন মানী লোকের মেয়ে। সব বলচি। আচ্ছা আপনি বাইরে একটু অপেক্ষা করুন আমি ছাত্রীকে বলে আসি আজ আর পড়াব না। যাবেন না কিন্তু এখুনি আসচি। বলিয়া শাশ্বতী হাইহিল জুতার খট্‌খট্ আওয়াজ করিতে করিতে অন্দর মহলের দিকে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেকের ভিতরই শাশ্বতী বাহিরে আসিয়া অনিমেষকে কহিল, চলুন।

—কিন্তু আমার যে আবার অফিস আছে। নটা যে প্রায় বাজল।

—এতদিন পরে দেখা, না হয় প্রাক্তন কলেজ বন্ধুর জন্যে একদিন একটু দেরীতেই অফিস গেলেন। কেরাণীর চাকরী নিশ্চয়ই করেন না। কলেজে ডিগ্রি পরীক্ষা পর্যন্ত দেখেচি আপনি খুব ব্রিলিয়েণ্ট রেজাণ্ট ক'রতেন। নিশ্চয়ই সেই সুশিক্ষার কল্যাণে অন্ততঃ একটা অফিসারের চাকরী পেয়েচেন।

—আজ্ঞে না কেরাণীগিরি করার সৌভাগ্য লাভ করিনি। বর্তমানে পদার্থবিদ্যার গবেষণাগারে ৩০০ টাকার বেতনের একটা চাকরী করচি! একটা নূতন রিসার্চে হাত দিয়েচি যদি সাকসেসফুল হই তাহলে ডবল মাইনে পাব বোধহয়।

—বা! মাষ্টার পরীক্ষা বুঝি আর দেন নি?

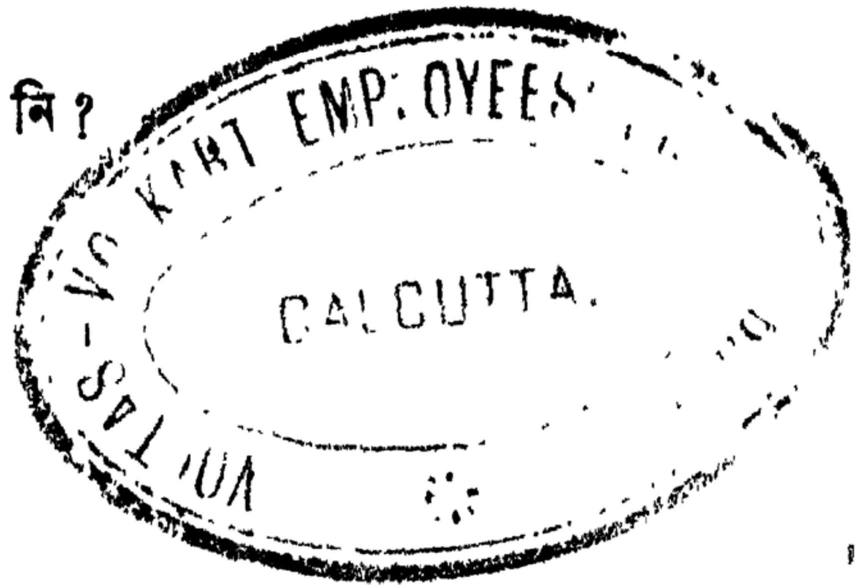
—হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

—পাশ করেন নি?

—হ্যাঁ।

—কোনক্লাস পেয়েছিলেন?

—ফার্ষ্ট ক্লাস।



—ব্রিলিয়েণ্ট! ব্রিলিয়েণ্ট! শাশ্বতী উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে। প্রফেসরি নিলেন না কেন? শাশ্বতীর মুখে আবার প্রশ্ন।

—পাওয়া গেলে তো নোব? এই বেশ আছি। তা আপনার ব্যাপার তো বললেন না? ইউনিভারসিটির বি, এ পরীক্ষায় তো পাশ করেছিলেন জানি। সংসারের বিয়ে তে কবে উত্তীর্ণ হলেন?

শাশ্বতীর মুখ অকস্মাৎ বিবর্ণ হইয়া যায়। মাথার সিঁদুরের কথাটা মনে পড়িয়া গেল। কহিল, হ্যাঁ এইমানে দু'বছর হ'ল বিয়ে হয়েচে। এই কথা কয়টি বলিয়াই শাশ্বতী কি রকম যেন ব্যস্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা আজ চলি, হ্যাঁ, আসবেন একদিন আমাদের বাড়ী। ৪, বালিগঞ্জ প্লেস, কেমন। বলিয়া একটা ট্যাক্সিতে গিয়া চড়িল।

অনিমেষ মূঢ়ের ন্যায় ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা কি রকম জটিল বলিয়া অনিমেষের মনে হইতে লাগিল। কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া অনিমেষ পরের দিনই শাশ্বতীর বাড়ী গিয়া উপস্থিত হয়। শাশ্বতী বাড়ীতেই ছিল। অনিমেষের কোন অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। শাশ্বতী তাহার পিতার সহিত অনিমেষের পরিচয় করাইয়া দেয়। ভুবনেশ্বর চৌধুরী কিছুক্ষণ মামুলী আলাপ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। শাশ্বতী নানারকম অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলিতে থাকে। অনিমেষও ছাড়িবার পাত্র নয়। কহিল, কি আপনার কর্তার সঙ্গে তো আলাপ করিয়ে দিলেন না।

শাশ্বতী কিঞ্চিত বিব্রত বোধ করিয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে আলাপ যে করিয়ে দেব তা তিনি কি এখানে থাকেন, তিনি তো ঘর জামাই নন।

অনিমেষ লজ্জিত হইয়া কহিল, না না তা বল্চি না মানে জিজ্ঞেস করছিলাম তিনি এখন এখানে বেড়াতে এসেচেন কিনা।

শাশ্বতী সত্যকথাটি চাপিয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, না তিনি বাইরে চাকরী করেন। ওখানেই ওঁর কোয়ার্টারে থাকি। বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেচি।

অনিমেষ যথাসময় উঠিয়া পড়িল। শাশ্বতী বার বার করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিল আরেকদিন আসিবার জন্য। কলেজে পড়িবার সময় অনিমেষের বেশ খানিকটা আসক্তি ছিল শাশ্বতীর উপর। শাশ্বতী আলাপী ছিল বটে তবে তাহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়া যে খারাপ কিছু ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহাকে শাশ্বতীর ভ্রুকুঞ্চিত প্রতিবাদের প্রাবল্যে সরিয়া পড়িতে হইয়াছে। অনিমেষ চতুর ছিল বলিয়া মনের বাসনা মনেই চাপিয়া রাখিয়াছিল। কোনদিন কোন আবেদন করিবার চেষ্টা করে নাই শাশ্বতীর নিকট। দিন কয়েকের ভিতরই অনিমেষ শাশ্বতীদের বাড়ীতে বেশ আপনজন হইয়া উঠিল।

এখন তখন আসে। শাশ্বতীর সহিত নানারকম আলাপ আলোচনা করে। শাশ্বতী অনিমেষের সহিত কথাবার্তা একটু সমীহ করিয়াই বলে কারণ অনিমেষ এম, এ ফার্স্ট ক্লাস। শাশ্বতী অনিমেষের ব্যক্তিগত কথা বড় একটা জিজ্ঞাসা করে না কারণ তাহলে অনিমেষেরও শাশ্বতীর ব্যক্তিগত কথা জানিবার অধিকার জন্মাইতে পারে। তবে একদিন শুধু বলিয়াছিল, আচ্ছা অনিমেষবাবু, আপনি যে এতদিন অন্তর অন্তর আসানসোল যান তাতে বৌদি মান অভিমান করেন না?

উত্তরে অনিমেষ বলিয়াছিল, মেয়েদের তো আছে ঐ একটাই ভূষণ—অভিমান। তা তিনিও যখন একজন মেয়ে তখন তাঁর সে আভরণ আছে বৈ কি? বলিয়া ফেলিয়া নিজেই একটু অপ্রস্তুত হইয়া পুনরায় কহিল, ওঃ! ভেরী সরি, আপনিও যখন একজন মহিলা তখন আপনার সুমুখে কথাটা বলা ঠিক হয়নি কারণ স্বগোত্রী হিসেবে কথাটা আপনার গায়েও লাগবার কথা।

শাশ্বতী একটু কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, তা কথাটা আপনার ঠিক যুক্তিসঙ্গত হ'ল না। নারী জাতটার ওপর এতবড় দোষ চাপানটা নিতান্ত এক তরফা হয়ে গেল কিন্তু। খানিকটা শ্লেষও আছে কথাটার ভেতর মনে হ'চ্ছে।

অনিমেষ কহিল, দেখুন কথাটা আমি শ্লেষ করে বলিনি, অভিমান জিনিষটা কি খারাপ? খৈয়ামের অভিমানের অধ্যায়টা কত কাব্যিক বলুন তো? অভিমানের ভেতর নারীর যে অপূর্ব রূপটির বিকাশ হয় সেটি বিধুর হলেও মধুর কি কোন অংশে কম? আপনিই বলুন না, অভিমানের আবরণে নারী থাকে বলেই তো নারী নরের কাছে আদরিণী, নারী কোমল বলেই তো অভিমানী। ধরুন, যদি নারীর এই কোমলতা না থাকত তাহলে কি নর নারীর প্রতি আকৃষ্ট হত? নারী নরম বলেই তো নরের কাছে পরম।

এই আলোচনায় শাশ্বতীর গৌরবর্ণ সুন্দর মুখখানি নিমেষের মধ্যে আপেলের মত লাল হইয়া উঠিল। কহিল, তা হলে বলতে চান নারীর মুখ্য উদ্দেশ্য নরকে তালিম দেওয়া। কিছু মনে করবেন না, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী বড্ড সীমাবদ্ধ। আপনার আউটলুকের সারকামফারেন্স মোটেই ওয়াইড নয়।

অনিমেষ কহিল, যদি অভয় দেন তো বলি,—

শাশ্বতী কহিল, কি মুস্কিল অভয় দেওয়ার কি আছে, বলুন না।

অনিমেষ মতামতের অপেক্ষা না করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল, এখানে কোন গুরুজন টুরুজন আসবেন না তো। সিগারেটটা ধরালুম কিন্তু—

হাঁা, হাঁা অনায়াসে—শাশ্বতী সম্মতি দেয়।

অনিমেষ বলিয়া যায়, দেখুন মানুষের জন্ম থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস ঘাটলে কি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না যে, নরের জন্যেই নারী, নারীর জন্যেই নর। এই যদি না হবে তো সৃষ্টি তো ছারে খারে যাবে।

—তাহলে অসভ্য যুগ আর সভ্য যুগের ব্যবধান কেন হয়েছে বলুন? অসভ্য যুগে নর হলেই হ'ল—নারী হ'লেই হ'ল, মিলনে কোন বাধা থাকত না। কিন্তু সভ্যযুগে প্রশ্ন এল নির্বাচনের, বিচার এল ভাল মন্দের। আপনি বলতে পারেন আপনার স্ত্রী আপনার জন্যে অভিমান করেন—যা আমি জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বৌদির সঙ্গে ধরুন আমার কর্তার আলাপ হ'ল—এবং সেই আলাপে কি কোন কারণ নিয়ে চট ক'রে আমার কর্তার ওপর অভিমান করে বসতে পারেন বৌদি? না আমার স্বামীই পারেন তাঁর ওপর অভিমান ক'রতে? প্রতিটি নরের যদি প্রতিটি নারীর ওপর এবং প্রতিটি নারীর যদি প্রতি নরের ওপর আসক্তি থাকে, আপনার কথা মত, তাহলে সভ্যতার আর ছোঁয়া লাগল কোথায় পৃথিবীতে? জানোয়ার আর মানুষের ভেতর তফাৎ রইল কোথায় এতে?

অনিমেষ কহিল, এ ব্যাপারে বিশেষ কিছুই তফাৎ নেই, জেনে রাখতে পারেন। নর ও নারীর আকর্ষণটা ঠিক চুম্বকেরই মত। স্থান কাল পাত্রের কথা আপনি বলতে চাইচেন বুঝতে পেরেচি—না এ আকর্ষণ বাস্তবিক স্থান-কাল পাত্রের ভেদাভেদ জানে না। একদল লোক নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে—এই যেমন ধরুন—তাদের বিবাহিত স্ত্রীর প্রতি যেন 'টেম্পটেশন' না যায় কাউর, এই কারণে 'পর স্ত্রী মাতৃরূপেণ পূজ্যতে' ইত্যাদি স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রেখেচে। আসলে এ হল মনের স্বাধীনতাকে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনকে যাকে বলে ফাঁকি দেওয়ার আধার হচ্চে এই স্তোকবাক্য গুলো। অবচেতন মনকে কিন্তু ফাঁকি দেওয়া যায় না সহজেই।

শাশ্বতী উদ্বেলিত হইয়া কহিল, কি বলচেন এসব। এই সেদিন কি একটি পত্রিকায় অধ্যাপক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "মানব জাতির ক্রমবিকাশ" নামে একটি প্রবন্ধে দেখলুম—লেখক বলেছেন, বিবর্তনের মাধ্যমেই মানব জাতির মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ঘটে। অসভ্য জাতির মধ্যে যে সব কদর্য রীতিনীতির প্রচলন ছিল সে গুলি ধুলিসাৎ করে সভ্যজাতি। তারপর আরো

সুসভ্য জাতির শুভাগমনে নিত্য নূতন রুচির যেমন আবির্ভাব ঘটতে থাকে তেমনি জন হিতকর বিলি ব্যবস্থা এবং আইন কানুন দ্বারা সমাজ সুসংস্কৃত হয়ে ওঠে। তিনি এই কথা মোটেই বলচেন না যে পুরুষ মাত্রেই যে কোন নারীর প্রতি এবং নারী মাত্রেই যে কোন পুরুষের প্রতি আসক্ত হ'তে পারে। তিনি বলচেন, অবশ্যই সেখানে নির্বাচনের প্রশ্ন থাকবে, অধিকারের প্রশ্ন থাকবে। অধিকার অনধিকার সভ্য জাতেরই সৃজন—এবং এই অধিকার অনধিকারকে বুঝতে হ'লে শিক্ষারও প্রয়োজন। শিক্ষা যখন সভ্য সমাজের একটি বিশিষ্ট অবদান তখন তাকে গ্রহণ ক'রে তার নির্দেশ মেনে চললে মনুষ্য জাতির কল্যাণ বৈ অকল্যাণ হবে না। মানবজাতিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করবার অভিলাষেই বর্ণ, শ্রেণী সমাজ প্রভৃতি সৃষ্টি করেচেন আমাদের সুসভ্য আদী-পুরুষরা। হ্যাঁ লেখক বলেছেন, সভ্যতার ক্রম বিকাশের সাথে সাথে মানুষের চিন্তা ধারাও হয়েছে উন্নত। সৃষ্টির পেছনে যেমন আনন্দ আছে সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার ভেতরও তেমনি আনন্দ আছে—এ কথা শিখেচে মানুষ সভ্যতার স্নেহের ছায়ায় দাঁড়িয়ে। শিক্ষা, দীক্ষা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ, নিরাপত্তা শান্তির দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্চে মানুষ। সৃষ্টি বলতে আজকের সভ্য মানুষ শুধু প্রজননই বোঝে না, বোঝে সৃজন। কিন্তু লেখক বৈজ্ঞানিকদের দিকে কটাক্ষ হেনেছেন তাঁর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, বিজ্ঞান মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে কিন্তু বিজ্ঞানীরা মানুষের ভয় উৎপাদন করেন। বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন মারণ অস্ত্রের আবিষ্কার ক'রে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন পৃথিবীকে। পৃথিবী একটা যন্ত্রে পরিণত হওয়ার উপক্রম হ'য়েছে। মনের যে একটা প্রাচুর্য আছে একথা অস্বীকার করতে শেখাচ্ছেন বৈজ্ঞানিকরা। যন্ত্রের দ্বারা মানুষের জন্ম ব্যবস্থার প্রচেষ্টাকে তিনি নিন্দে ক'রেচেন। এতে মানুষ অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে যন্ত্রচালিতের মত সব কাজ ক'রবে, মানুষের ভেতর থাকবে না তখন প্রাণের প্রাচুর্য, জীবন-বোধের ঐশ্বর্য। বিজ্ঞানকে জনকল্যাণে লাগানই বিজ্ঞানীদের কর্তব্য হওয়া উচিৎ। পৃথিবীর সাহিত্য, পৃথিবীর দর্শন যেমন আজ উন্নতির চরম শিখরে তেমনি বিজ্ঞানও যদিও উন্নতির চরম শিখরে; তবে তফাৎ এইখানে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শনের কাছ থেকে মানুষের কল্যাণ ভিক্ষা চাইলে তা পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের অকল্যাণ করার বিধান চাইলে শুধু হাতে ফিরতে হয়। অথচ বিজ্ঞানের কাছে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ দুই-এর বিধান চাইতে গেলে প্রথমোক্তের চেয়ে শেষোক্তের বিধানই অধিকতর পাওয়া যাবে। লেখক

বলেছেন, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অতিরিক্ত প্রাদুর্ভাবের দরুণ কারিগরি শিক্ষা উন্নতিলাভ ক'রেছে একথা অনস্বীকার্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের প্রচণ্ড শিক্ষা-যন্ত্রের বহ্নিজ্বালায় মনুষ্যত্ব বোধ হ'য়েছে ব্যাহত, মানবতার শিক্ষা হ'য়েছে ব্যর্থ। আজকের স্তরের মানুষ সহ্য ক'রে যাচ্ছে তার ক্ষতি নির্লিপ্ত বিশপের মত যে বিশপ নিজের চোখে চোরকে স্বর্ণ নির্মিত আলোর আধারগুলো চুরি ক'রে নিয়ে যেতে দেখেও চুপ ক'রে বসেছিলেন কারণ তিনি অবলোকন ক'রেছিলেন দিব্য-চক্ষুতে চোরের ভেতরটা, যে ভেতরটা ছিল ব্যাপক কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রশান্ত বিশপ হৃদয় দিয়ে বুঝেছিলেন সেই ব্যাপক আঁধারে যে আলোর জন্ম হবে সে আলো ব্যাপক হইবে। আঁধার বিজড়িত বিজ্ঞান শিক্ষার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ব্যাপক আলোকের জন্মগ্রহণ হবে সেই আলোতে কেউ ঝলসে মরবে না, সেই আলোতে কেউ দগ্ধ হবে না, সেই আলোয় কাউর জ্বালার উদ্রেক হবে না, সেই প্রদীপ্ত আলোয় ঝলমলিয়ে উঠবে দিক দেশ, প্রশমিত হবে মানুষের দুঃখ-ক্লেশ।

লেখকের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিয়া শাশ্বতী কহিল, ভদ্রলোকের ইতিহাস এবং দর্শনে যেমন অগাধ জ্ঞান তেমনি এঁর দৃষ্টিভঙ্গীটাও বৃহৎ।

—আপনি অমরের লেখা এতক্ষণ কপচে গেলেন, তাই বলুন। ও এসবও লিখছে নাকি? ওতো একজন অঙ্কের অধ্যাপক আমার স্কুলের সহপাঠী। আজকাল অমর লিখছে খুব ভাল। আমি অবশ্য ওর এইসব লেখা পড়িনি। তবে যা দু'চারটে গল্প প্রবন্ধ পড়েছি—লক্ষ্য করেছি যেমন ভাষায় দখল তেমনি ভাবের বন্যা আছে লেখায়। তবে ওর লেখার ষ্টাইলটা আমাদের আরেকজন বন্ধু স্কুলের সহপাঠী অমিতাভ মিত্রের মত। অমিতাভ স্কুলেই যা লিখত তা দেখে শিক্ষকরা আশ্চর্য হয়ে যেত। বিশ্বাসই করতেন না অনেক শিক্ষক যে ওগুলো ওর লেখা। কিন্তু আমি জানতাম ওর ওসব ওর নিজেরই লেখা কারণ টিফিনে অনেক সময় আমার পাশে বসে বসে লিখত। আমার সঙ্গে একটু বেশী বন্ধুত্ব ছিল। বেচারার এখন অবস্থা শোচনীয়। এই সেদিন দেখা হয়েছিল।

—শোচনীয় কেন? শাশ্বতী আড়চোখে প্রশ্ন করে।

—শোচনীয় বলে শোচনীয়। ও নাকি ওর স্ত্রীর অযোগ্য তাই ওর স্ত্রী ওকে ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে।

—আপনাকে ভদ্রলোক নিজের পারিবারিক কথাটা চট্ করে বলে দিলেন?

—চট্ করে তো বটেই একেবারে অকপটে, সহজভাবে। অদ্ভুত মানুষ ঐ অমিতাভ, ম্যাট্রিক পাশ করার পর আমরা যদিও সব ছাড়াছাড়ি হয়ে যাই। মাঝখানে দীর্ঘ দিন বিরতির পর আবার দেখা হল সেদিন। একই রকমের স্বভাব আছে। স্কুলে পড়তে কখনও মিথ্যে কথা বলতে দেখিনি। অথচ দারুণ নির্ভীক, যা সত্যি বলে ও জানে তা কাউকেই খাতির করে পরিবর্তিত করত না অথবা মিথ্যেকে সত্যি করার ব্যাপারেও কোনও খাতির-খুতির নেই অমিতাভের কাছে। শুনবেন? তাহলে একটা ঘটনা বলি—ক্লাস নাইনের ফাইন্যাল পরীক্ষায় অমিতাভের পাশের একটা ছেলে প্রশ্নপত্র দেখে প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে যায়। অমিতাভ আমাদের ফার্স্টবয় ছিল। ও খুব ভাল করেই লিখে যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশের ছেলেটির দুরবস্থা দেখে অমিতাভ তার নিজের খাতা দেখে দেখে ছেলেটিকে উত্তরগুলো বলে যেতে থাকে। এমন সময় অমিতাভের পাশের ছেলেটিকে 'কি বললি ভাল করে বল্' বলতে শুনে তার কাছে গার্ড এগিয়ে এসে তার খাতাটি তুলে নিলেন। এই দেখে অমিতাভ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে উঠে বললে, স্যার, শাস্তি দেওয়ার হলে আমায় দিন, ওর কোনও দোষ নেই, ওকে আমিই নিজে যেচে খাতা থেকে বলে দিয়েছি। বলা বাহুল্য শিক্ষক মহাশয় এতে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন, সেই ছেলেটির খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে—অমিতাভের কান ধরে সোজা হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। হেডমাষ্টার সব শুনে সেই শিক্ষক গার্ডকে বললেন, আপনার কাজ আপনি করেছেন। এখন আমার কাজ আমি করি। এখন তো একে পরীক্ষা দিতে দেবই পরন্তু যেদিন রেজাল্ট বেরুবে সেদিন এর সত্যবাদিতা এবং নির্ভীকতার জন্যে একটা মেডেল দেব।

—ম্যাট্রিকে কোন ডিভিসনে পাশ করেছিলেন আপনার এই বন্ধুটি।

—ফার্স্ট ডিভিসনে তিনটে লেটার নিয়ে।

—এত ভাল ছেলে হ'য়ে পড়াশুনো করলেন না কেন?

—কারণটা কি অনুমান করে নিতে পারেন না? দারিদ্র্য। বৃদ্ধ মামা কোন একটা জমিদারের ষ্টেট-এ খাতা লিখে সামান্য টাকা পেতেন তাতে কি আর চলে? দরখাস্ত দিয়ে বাইরে একটা চাকরী পেল নিজের কৃতিত্বের জোরে অফিসারও হ'ল। তারপর বিয়ে করল। কিন্তু সহসা দুর্ভাগ্যের চরম আঘাতে চাকরীও গেল, বৌও গেল। বৌ বনাতে পারল না।

—আপনার বন্ধুর বৌ বনাতে পারল না, না আপনার বন্ধু বনাতে পারলেন না কোনটা ?

—আমি আমার বন্ধুকে যতদুর চিনি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার বন্ধু বনাতে গিয়েছিল—কিন্তু বন্ধুর স্ত্রীই বনতে চইনি। অমিতাভ কি স্বভাবের মানুষ যদি তার সঙ্গে পরিচয় থাকত তাহলেই বুঝতে পারতেন অমিতাভের আর একটা মস্ত বড় গুণ দেখেছি অমিতাভ কখনও কারও উপর অধিকার খাটাতে যেমন যায় না তেমনি কারও কাছে কখনও প্রার্থীও হয় না। অদ্ভুত মানুষ সত্যি অমিতাভ !

—তা আপনার বন্ধুটি লেখায়ও তো নাম করতে পারতেন ? বলছেন যখন ভাল লিখতে পারতেন ? অবশ্য কি করেই বা আর লিখবেন ? পড়াশুনোই যখন নেই তখন লিখবেন কি করে ?

—আপনার কি ধারণা ইউনিভারসিটির গোটা দু'চার ছাপ থাকলেই খুব শিক্ষিত হয়ে গেল ? অমিতাভ কি পরিমাণে পড়াশুনো করে তা আপনি জানেন না তাই বলছেন। কি পাশ্চাত্য সাহিত্য কি প্রাচ্য সাহিত্য সব যেন গুলে খেয়েছে।

—বাবা ! অত চটচেন কেন ? না-হয় না জেনেই বলে ফেলেচি। আপনার মত বলচি, যদি অভয় দেন তো বলি—

—বলুন কি বলবেন।

—এতই যদি পণ্ডিত লোক হন তিনি এবং লেখায়ও যদি ন্যাক থেকে থাকে তাহলে লিখেই বা নাম ক'রচেন না কেন ? এই তো যে লেখকের কথা বলছিলাম, অধ্যাপক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়—দেখতে দেখতে নাম করে ফেললেন ভদ্রলোক কেমন ?

—লেখা যে ছেড়ে দিয়েচে।

—লেখেন খুবই আপনারা বোধ হয় জানেন না, নিশ্চয়ই সেসব লেখা কেউ ছাপে না বলে এখন অগত্যা লেখা ছেড়ে দিয়েচেন। প্রতিভা নিশ্চয়ই নেই। থাকলে সেই প্রতিভার স্ফুরণ না হ'য়ে পারে না। ছাড়ার সাধ্যি আপনার বন্ধুর থাকত না। কি করেন ভদ্রলোক ? বেকার নিশ্চয়ই ?

—না, উপস্থিত একটা অফিসে চাকরী করচে।

—কিসের চাকরী ?

—কেরাণীর।

—অ্যাঁ!—শব্দটি শাশ্বতীর মুখ হইতে সত্যই অতিশয় বিস্ময়ের সহিত বাহির হইল, যাহার জন্য অনিমেষও বিস্মিত না হইয়া পারিল না, কহিল, আরে বাবা! আপনি মহাআশ্চর্য হ'য়ে গেলেন যে, যেন আমার বন্ধুর জীবনের সাড়ে পনের আনাই বৃথা হ'য়ে গেছে!

শাশ্বতী নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, হ্যাঁ, তা একটু আশ্চর্য হলাম বৈকি! অমন প্রতিভার শেষকালে কিনা এই দশা হ'ল?

সেদিন আর বিশেষ আলাপ-আলোচনা জমিল না। অনিমেষ উঠিয়া পড়িল।

(৫)

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী এদিকে অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়কে শক্তিশালী লেখক হিসাবে স্বীকার না করিয়া আর পারিলেন না। অমরনাথের গল্প এবং প্রবন্ধের জন্য পাঠক মহলের কাছ থেকে এমন সব সপ্রশংস এবং উচ্ছ্বসিত পত্রাদি আসিতে লাগিল যাহার ফলে অমরনাথের লেখা লইয়া পত্রিকা জগতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। অমরনাথের লেখা প্রায় নিলামে চড়িবার দাখিল, কে কত বেশী দাম দিয়া লইতে পারে এইরকম প্রায় অবস্থা। এ হেন সময় অমিতাভের উপন্যাস শেষ হইল। অমরনাথ সেই উপন্যাস লইয়া কোন একটি সুবৃহৎ পত্রিকায় দেখাইতেই পত্রিকা সম্পাদক মোটা টাকার বিনিময় উহা প্রকাশ করিবার অধিকার গ্রহণ করিল।

অমরনাথ অমিতাভকে অনেক করিয়া অনুরোধ করিয়াছিল উপন্যাসটি অমিতাভের নামেই প্রকাশ করিতে।

সেদিন অপরাহ্নে অমরনাথ অমিতাভের হোষ্টেলে আসিয়া অমিতাভকে করুণভাবে কহিল, অমিতাভ আমায় মুক্তি দে ভাই। তুই তোর নিজের নামেই উপন্যাসটা বের কর। পত্রিকাসমূহের অফিসে যাতায়াতগুলো তোর এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিসেবে না হয় আমিই করব।

কিন্তু অমিতাভ স্মিতহাস্তে কহিল, আমার এই উপকারটা ক'রতে তোর পক্ষ থেকে যে কেন এত আপত্তি আসচে আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না অমরনাথ।

উত্তরে অমরনাথ বলিল, সত্যি কথা বলতে কি, আমি আর এই মিথ্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চলতে পাচ্ছি না ভাই, আমায় তুই রেহাই দে। পথে ঘাটে নিজের নামের এই মিথ্যা প্রশংসার মালা গলায় দিতে ভাল লাগে? কলেজে ছেলেরা অধ্যাপকরা আমায় যে চোখে দেখতে আরম্ভ ক'রেছে তা আর কি বলব। একটা দারুণ প্রতিভাবলে তাদের কাছে আমি সবসময় নমস্ত। জোচ্চুরি ক'রে এই খ্যাতির মুকুট পরা সত্যিই আমায় ভীষণ পীড়া দেয় অমিতাভ। নিজেকে কত ছোট মনে হয় জানিস? উপন্যাসটা তোর নামেই ছাপা হোক, তুই মত কর।

অমিতাভ সহাস্তে বলিয়াছিল, আমার মধ্যে তুই নিজের প্রকাশ দেখ না, যেমন তোর মধ্যে আমি আমার প্রকাশ দেখি। তুই আমি অভিন্ন এই কথাটা ভেবে নে না।

অমরনাথ কৃত্রিম রাগের সহিত বলিয়াছিল, তাই যদি হয় তাহলে আমি যখন আমার বাড়ী তোকে নিয়ে যেতে চাইলুম তখনই বা তুই—তুই আমি অভিন্ন কথাটা মনে ক'রে নিলি না কেন?

ইহার উত্তরে অমিতাভ প্রসন্ন হইয়াই বলিয়াছিল, তুই আমি অভিন্ন এটা সবসময় আমি ভাবি। কিন্তু তোর দাদার সঙ্গেও আমি অভিন্ন একথাটা কেমন ক'রে ভাবি বল্? সেখানে সম্পর্ক এতখানি ভিন্ন যে গলগ্রহের প্রশ্ন এসে যায়। তুই থাকিস তোর দাদার কাছে। তোর দাদা একজন বিত্তবান ব্যক্তি। সেখানে আমি গিয়ে থাকলে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তুইই ভেবে দেখ্।

অমরনাথ কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল, আমার দাদা যাই হোক অন্ততঃ তোর বউ-এর মত অর্থ আর আভিজাত্যের গুমর নেই তাঁর। তুই গেলে তোকে তিনি মোটেই গলগ্রহ মনে ক'রবেন না কারণ তিনিও ছোট থেকে বড় হ'য়েছেন, অনেক দুঃখ কষ্ট পোহাতে তাঁকেও হ'য়েছে জীবনে। তাই তিনি সহানুভূতিও ক'রতে জানেন।

—তোর দাদা দেবতুল্য মানুষ, তাঁকে অশ্রদ্ধা করার স্পর্দ্ধা নেই আমার। কিন্তু দেখ, অমরনাথ, জাগতিক নিয়মকে, প্রকৃতিকে এড়ানোর হাত নেই মানুষের। 'সিমপ্যাথি' যে কালক্রমে 'পিটি'তে রূপান্তরিত হয়। আমার বৌ-এর কথা বল্লি, ওটা ওর প্রকৃতি ঠিকই কিন্তু ওর নিজের প্রকৃতির জন্তে ও দায়ী নয় ভাই, দায়ী হ'চ্ছে ওর পরিবেশ। প্রকৃতি যে পরিবেশের দান। বাঘের পেট থেকে ঘোড়াও আশা করিস না, ঘোড়ার পেট থেকে বাঘও আশা

করিস না। এও তেমনি যার যেমন পরিবেশ হবে তার তেমনি প্রকৃতি হবে।

—তোর সঙ্গে তর্ক ক'রতে গেলে আরেক জন্ম ঘুরে আসতে হবে। দরকার নেই বাবা, তোকে গিয়ে থাকতে হবে না, আমাদের বাড়ী। তোর উপন্যাস আমার নামে বেরুলে আমি আপত্তি ক'রব না, ভাবব তুই আমি অভিন্ন, হ'য়েচে তো। কিন্তু আমি যে মহাবিপদে পড়ি সময় সময়—লোকে আমাকে যখন অভিনন্দিত করে তখন যে আমার অবস্থা শোচনীয় হয়। কিছু একটা তো বলতে হয়, সবসময় আমার মুখে কথাও যুগয় না। আর কাঁহাতকই বা বিনয় হাসি, গদগদ হাসি হাসব। সেই সময়টা আমি ঘামে একেবারে নেয়ে যাই। এখন দেখচি, ভগবান আমায় বোবা ক'রে পৃথিবীতে পাঠালেই ভাল ছিল, তাহলে তোর দেওয়া ভূমিকার অভিনয় মিথ্যা কথার উচ্চারণ না ক'রেও ক'রে যেতে পারতুম। এই কথায় অমিতাভ হাসিয়া ফেলিল।

অমরনাথ পুনরায় কহিল, আচ্ছা তুই যে বললি মানুষের প্রকৃতি তার পরিবেশ থেকে উদ্ভূত, তাহলে 'জন্মগত' কথাটার কি হবে? প্রতিভাও পরিবেশের দান?

ইহার উত্তরে অমিতাভ বলিল, প্রতিভাই বল আর প্রকৃতিই বল তার সৃষ্টির পেছুনে উত্তরাধিকার এবং পরিবেশ দু'টো জিনিষই অঙ্গাঙ্গিভাবে কাজ করে। দু'টোর কোনটাকেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে দেখা যায় অনেক সময় পরিবেশের অতিমাত্রায় প্রভাবের গুণে মানুষ সেই পরিবেশের প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হয়, সেখানে সময় সময় উত্তরাধিকারকে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাকতে হয়। যেমন দেশবন্ধু এবং বিদ্যাসাগরের সন্তান মাহাত্ম্যের উত্তরাধিকারী হ'য়েও অসৎ সংসর্গের প্রভাবে নিজেদের বিকৃত ক'রে ফেলেছিলেন। বিশিষ্ট দার্শনিক রাসেল পরিবেশের ওপর ততটা জোর দেন নি, তিনি উত্তরাধিকারের ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেচেন, প্রতিভাধর তৈয়ারী করার ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গের ওপর যদি প্রজননের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় তাহলে সুফল পাওয়া যায়। পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনকে ভোগের সামগ্রী বলে মনে ক'রতে বলচেন বাকী সবাইকে। এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ বাস্তবিক যদি এই ব্যবস্থা চালু হয়, তাহলে জীবজগত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচণ্ড বন্যায় বিধ্বস্ত হবে, সামাজিক নিয়মকানুন, আচার ব্যবহার তাহলে মার খাবে। ঐ মতবাদের ঐটুকু যদি মনে সব সময় রেখে চলা যায় যে, পিতামাতা নিজেরা

গুণী যদি না হন তাহলে গুণধর সন্তান লাভ করা সহজ হবে না তাদের পক্ষে তাহলে প্রত্যেক পিতামাতা অন্তত ভয়ে ভয়ে নিজেদের গুণী ক'রে তোলবার জন্য সচেষ্ট হবেন—ফলে সমাজের আপনিই উপকার হবে।

হোষ্টেলের বেয়ারা দু'কাপ চা দিয়া গেল। অমিতাভ তাহাকে খাবার আনিতে কিছু পয়সা দিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আজ পৃথিবী কেমন যেন অন্তঃসারশূন্য হতে চলেছে। দিনে দিনে যেন দয়া, মায়া, মমতা, প্রাণের প্রাচুর্য উবে যেতে বসেছে পৃথিবী থেকে। এর জন্য দায়ী বৈজ্ঞানিকরা! গোটা পৃথিবীকে তারা একটা যন্ত্র হিসেবে তৈরী করতে চাইচেন কিন্তু তাতে পৃথিবীর কি পরিমাণ ক্ষতি হবে সেদিকে তাদের একেবারে ভ্রূক্ষেপ নেই। বিজ্ঞানকে আমি শ্রদ্ধা করি, তার অবদানকে আমি ভালবাসি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের অপব্যবহার করচেন। বিজ্ঞানকে যদি মানবজাতির কল্যাণের বাহন মনে করে তাকে দিয়ে ক্রমান্বয় পৃথিবীর উন্নতি সাধন করা হয় তাহলে বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু তা না করে আজ জীবগতের ধ্বংসের বাহন করে তুলতে চাইছেন—ওঁরা। সভ্যতার মুখোস পরে অসভ্যতার প্রশ্রয় দেওয়ার নজির কেন আজও মেলে! মানব যদি দানবে পরিণত হয় তাহলে মানবত্বের বড়াই কি নিয়ে করব বল্? নানানরকম অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার করে ধ্বংসের মুখে পৃথিবীকে টেনে নিয়ে যাওয়া তো হচ্ছেই পরন্তু, স্নেহময়ী পরমাশ্চর্য প্রকৃতির পেছনেও উঠে-পড়ে লাগার এমন ব্যবস্থা চলেছে যার ফলে মানুষের জীবন হবে বিপন্ন, নৈতিক বোধ যাবে চুপসে, নিরাপত্তা হবে ব্যাহত। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শিশুর জন্মব্যবস্থা পৃথিবীর পক্ষে কতখানি অকল্যাণ বল দিখিনি। অনেককিছু শিক্ষালাভ করেচে মানুষ ঠিকই, সুশিক্ষিত হয়েছে মানুষ এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই কিন্তু ঠিকমত দেখতে গেলে মানুষ সভ্য হয়নি আজও, আজও তার মধ্যে রয়েছে হিংস্রতার বহ্নি। শিক্ষার দম্ভে মানুষ এতই অন্ধ হয়ে উঠেছে যে ব্যাভিচারকে আচার বলে অধ্যায়িত ক'রে পৃথিবীর মাথার উপর কল্যাণের বোঝা চাপিয়ে দিয়েচে। ইহার ভিতর কখন যে হোষ্টেলের ভৃত্য খাবার রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহা কাহারও হুঁস নাই। দুজনে চা, খাবার খাইয়া লইল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ গড়াইয়া গিয়াছে। অমরনাথ সেদিনের মত উঠিয়া পড়ে।

শাশ্বতীর সারাটা দিনে সময় আর কাটিতে চায় না। বিভিন্ন পত্রিকা এবং বই পড়িয়াই কোন ক্রমে দিন অতিবাহিত হয়। ছোট ভাই সমীর

চাকরের সঙ্গে গিয়া তাহার জন্য বই আনে। দিনে একটা বইতে শানায় না, অতিরিক্ত টাকা জমা দিয়া দু'খানি বই পড়িবার জন্য সম্প্রতি শাশ্বতী ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। সময় কাটাইবার একটি উপায় হিসাবে কলেজ বান্ধবী অনিমার অনুরোধে কোন একটি মেয়েকে বিনা পারিশ্রমিকে পড়ানোর দায়িত্ব লইয়াছে পিতার অজ্ঞাতে। কোন মতে পিতা যদি জানিয়া ফেলেন, এই কারণে শাশ্বতী নিজের পরিচয় সেখানে ভাঙে নাই। বাবা তাঁহার পাটের ব্যবসায় সকাল ন'টার সময় বাহির হন, ফেরেন রাত্রি আটটায়। মায়ের সঙ্গে আর কতক্ষণ গল্প করা যায়। মায়ের মতের সঙ্গে তাহার মোটেই খাপ খায় না। যদিও অমলাদেবীর বয়স চল্লিশের অধিক নয়। তথাপি তিনি যেন একটু বেশী রকমের প্রাচীনপন্থী হইয়া পড়িয়াছেন। আবহমান কালের সংস্কার মানিয়া চলিবার জন্যই যেন তাঁহার পৃথিবীতে আসা। সকালে আহ্নিক, তুলসী তলায় প্রদীপ ধরা, স্বামীর চরণামৃত খাওয়া, হেঁসেলে গিয়া ঠাকুরকে রান্নাবান্নার ব্যাপারে সহায়তা করা, দু'টায় মধ্যাহ্ন ভোজন, দুপুরে শুইয়া শুইয়া মহাভারত পাঠ, বৈকালে আবার সংসারের ভালমন্দ দেখাশুনা, সন্ধ্যায় ঠাকুর সেবা ইত্যাদি ব্যাপার শাশ্বতীর কাছে এক ঘেয়ে লাগে। তাহার মা যখন তাহার বাবার চরণামৃত গ্রহণ করেন তখন সে মনে মনে ভাবে যোগ্য ব্যক্তির চরণামৃত গ্রহণ করা সুশোভন, অযোগ্যের চরণামৃত গ্রহণ অশোভন। আজ সে তাহার মায়ের মতন করিয়া স্বামীর চরণামৃত না হোক, চরণ ধূলি লইতে পারিত কিন্তু বিধি যে বাধ সাধিলেন! তাহার কি অপরাধ? অযোগ্য অক্ষম স্বামীর হাতে পড়িলে এমন দশাই হয়। অনেক সময় শাশ্বতী অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে না। গোপনে সে দু'চার ফোঁটা অশ্রুপাত করে বৈকি। তাহার সবচেয়ে ভয় ব্যারিষ্টার পত্নী দিদি তপতীকে। দিদিকে দেখিলে সত্যই লজ্জা বোধ হয় আর জামাইবাবুকে দেখিলে তো কথাই নাই। দিদির ঐ 'আহা বেচারা' প্রভৃতি শব্দগুলি তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দেয়—

শাশ্বতীই সবচেয়ে বেশী তাহার পিতার আদর পাইয়াছে। কারণ তপতী শাশ্বতী অপেক্ষা এক বছরের বড় হইলেও বিবাহ হইয়াছে তাহার ছয় বৎসর পূর্বে। ম্যাট্রিক পাশের পর পড়ায় আর তাহার ঝোঁক না থাকায় ভুবনেশ্বর বাবু তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শাশ্বতী বি, এ পাশ করে ১৯ বৎসর বয়সে। বি, এ পাশের এক বৎসর পরে তাহার বিবাহ হয়। অতএব, শাশ্বতী পিতার সান্নিধ্য অধিকতর লাভ করে, ফলে সেই

পিতার আদরটা বেশী করিয়া পাইয়াছিল। অত্যন্ত আদরে মানুষ বলিয়া তাহার অভিমানটাও একটু বেশী।

সময় আর শাশ্বতীর ফুরাইতে চায় না। কাঁহাতক আর বই পড়া যায়। পাশের বাড়ীর নববিবাহিত দম্পতির নিবিড় প্রেমালাপ সে অনেক সময় লক্ষ্য করে। ঈর্ষ্যা হয় না, অশ্লীল লাগে। তবে অবচেতন মনে কি হয় জানা যায় না। স্কুল হইতে ছোট ভাই সমীর ফিরিলে তাহার সহিত যে দু'দণ্ড বসিয়া গল্প করিবে তাহারও জো নাই—এক ফোঁটা ছেলে সে যে, এগার পার হইয়া বারয় সবে পড়িয়াছে। স্কুল হইতে আসিয়াই বইখাতা ফেলিয়া ব্যাট-বল কি ফুটবল লইয়া সে তাহাদের বাহিরে 'লনে'এ চলিয়া যায়। ড্রাইভারকে বলিলে এখুনি গাড়ি বাহির করিতে পারে। একটু বেড়াইয়া আসাও যায় কিন্তু একলা বেড়াইতে শাশ্বতীর মোটেই ভাল লাগে না। অগত্যা অনিমেষের প্রতীক্ষায়ই থাকিতে হয় শাশ্বতীকে। লোকটি আসিলে তবুও অযোগ্য লোকটার কিছু কিছু খবর পাওয়া যায়। শাশ্বতীর রাগ হয়—অযোগ্য ছাড়া আর কী? যে লোক স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে পারে না, সে অযোগ্য ছাড়া আর কি হতে পারে? একবার দেখতে পর্যন্ত আসে না, পাছে ভরণ পোষণের ভার গলায় নিতে হয়? ওঃ! কি দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্ম! অনিমেষ টাও সেই রকম, ওই লোকের আবার প্রশংসা করে! স্কুল-কলেজে অমন দু' একটা কবিতা, প্রবন্ধ সবাই লিখতে পারে। অনিমেষটার যেন সবেতে বাড়াবাড়ি, ওনার ষ্টাইল নাকি অমরনাথবাবু ধার করেছেন। শুনলে গা জ্বালা দেয়! ওরকম তিনটে লেটার নিয়ে ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলে ভুরিভুরি আছে। আত্মীয়-স্বজনের কাছে কতখানি মুখ পোড়ানি? নিজের স্কন্ধে দোষ নিয়ে সবাইকে কিনা বলতে হয় রাগ করে চলে এসেছি বাহিরে থাকা আমার দ্বারা পোষায় না। কিন্তু লোকের মুখে কতদিনই বা হাত চাপা দিয়ে রাখা যায়। গুণধর স্বামীর কথা পাঁচকান হতেই বা কতদূর। না-হয় রাগ করে চলেই এসেছি, কেন নিয়ে যাওয়া যায় না আবার? ভালবাসা না থাক, অন্তত স্বামীর তো একটা কর্তব্য আছে স্ত্রীর ওপর। জানবেই বা কি করে নিরেট মুখ্যু যে। ভালবাসা-বাসিতে আর কাজ নেই, আমার ভালবাসা পাওয়ার দফা রফা হয়ে গেছে অনেকদিন। বিদ্যে না থাকলে শাশ্বতী ভাল কাউকে বাসে না, জ্ঞান যার না আছে তার কাছে শাশ্বতীর মন ছোটে না। তবে নিতে এলে না গিয়ে কি পারা যেতো,

স্ত্রীর কর্তব্য করতে অন্তত যেতে হতো, আর কাউর মত মুখ্যু তো নই। লোক জানতেও পারত না যে আমার স্বামী একজন কেরাণী। হাঁড়ি, কলসি, ঘরের অবস্থা দেখে বুঝত? বোঝার সাধ্যি কাওর হ'ত না। নিজে কটা টিউশানী করে সংসারের অবস্থা না হয় সচ্ছল করে রাখতুম। দারিদ্র্যের রূপটা আত্মীয়স্বজনের নজরেও আসত না। আমিই বা যেতে যাব কেন? রাগ কি আমারও থাকতে নেই? কলেজের ছেলের দল বাজে অছিলায় আমারই কাছে আসত, আমি যেতাম না। পাড়ার ছেলেরা উড়ো চিঠি আমাকেই দিত, আমি দিতাম না। একদিন যে কাঙালপনা উপভোগ করতাম আজ সেই কাঙালপনা কেমন ক'রে করব! এর চেয়ে মরণও ভালো।—এইভাবে নানান-রকম অসংলগ্ন চিন্তা শাশ্বতীর প্রাত্যহিক জীবনে আসিয়া ভীড় করে! আজও সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্বে সে যখন আরাম কেদারায় বসিয়া এমন করিয়া ভাবিতে বসিয়াছিল ঠিক সেই সময় অনিমেষ আসিয়া পড়িল। অনিমেষকে দেখিয়া, অনিমেষের সহিত কথা বলিয়া তবু তাহার একঘেয়ে জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে। শাশ্বতী কহিল, কি খবর? আজ যে দেরী?

অনিমেষ একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল দেরী হওয়ার দুটো কারণ। একটা হল ল্যাবেরেটরীতে প্রচুর কাজ জমে থাকার দরুণ, দ্বিতীয়টা হ'ল আপনার ফেভারিট রাইটার অধ্যাপক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ অনাবিল আড্ডা।

—হঠাৎ আমার ফেভারিট লেখকের কাছে? কি ব্যাপার?

—হঠাৎ না, প্রায়ই যাই; তবে আপনার সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠতা হওয়ার ফলে আজকাল আর বেশী যাওয়া হ'য়ে ওঠে না। তবে আজ যেতে হয়েছিল আপনার জন্যে।

—আমার জন্যে? মানে?

—মানে খুব সহজ। দুম্ ক'রে আপনি আপনার বোনঝির জন্মদিনে একটা নেমন্তন্ন পাইয়ে দিলেন, সেটা না হয় ভাল করলেন; কিন্তু আমায় কিছু লিখে আনতে বলেই তো মুস্কিলে ফেললেন। বাধ্য হ'য়ে দ্বারস্থ হতে হল অমরনাথের। আমি কি ওসব ছাই লিখতে টিখতে পারি।

—তিনি লিখে দেবেন?

—নিশ্চয়ই দিবে, দেবে না মানে। আরে বাবা, আমার সঙ্গে অমরনাথের সম্পর্কটা জানেন না। কেন বলেছি তো। আমাদের স্কুলের সহপাঠী।

একেবারে তুই-তুকারীর সম্পর্ক। একটা জন্মতিথির লেখা কেন, মাসিকপত্র বের করেন তো তার জন্তে ঝুড়ি ঝুড়ি লেখা এনে দিতে পারি। বার ক'রবেন একটা মাসিক পত্রিকা ? সাহিত্যে যখন আপনার সত্যিসত্যি এত অনুরাগ, আর, টাকারও যেখানে অভাব নেই। কি চুপ করে রইলেন যে!

প্রস্তাবটা শাশ্বতীর সোজাসুজি মনে আসিয়া ধরা দিল। কি যেন একটা কাজ সে এতদিন খুঁজিতেছিল কিন্তু কোন কাজেরই নাগাল যেন এতদিনে পায় নাই। আজ যেন হঠাৎ তাহার মিলিয়া গেল সেই কাজ। প্রস্তাবটা সত্যই তো বড় উত্তম। তাহার অকর্মণ্য জীবনের উপর তবুও খানিকটা কাজ চাপাইয়া দিয়া তাহাকে ব্যস্ত সমস্ত করিয়া রাখা যাইবে। শাশ্বতী কহিল, আপনার প্রস্তাবটা বাস্তবিকই চমৎকার। আপনার বুদ্ধির তারিফ করি। হাজার হোক ইনটেলিজেন্ট ব্রেন তো। তা সম্পাদক কে হবে ?

—সম্পাদক নয়—সম্পাদিকা হবেন আপনি।

—কেন আপনি হোন না সম্পাদক ?

—আমি ? আরে বাপ, সর্বনাশ। লোকে যে আমায় তাড়া ক'রবে! বলবে চিরকাল বিজ্ঞানের কচকচানি করে এখন সাহিত্যের ফটফটানি করতে এসেছ, চালাকি ?

—তাহলে আপনার বন্ধু অনেকদিন আগেই মার খেত।

—অমরনাথের কথা বলছেন ? কিসে আর কিসে! ও হ'ল প্রতিভাশালী ব্যক্তি। পড়ছেন তো ওর উপন্যাসটা যেটা ধরাবাহিকভাবে পত্রিকায় বিরুচ্ছে। ওঃ! রিয়েলি ট্যালেন্টেড। কি ব্যাপক চিন্তারাধা! কি অপূর্ব ভাষা! জীবনের ওপর যেমন অকুণ্ঠ ভালবাসা তেমনি অসীম সহানুভূতি।

হ্যাঁ পড়ছি বৈকি। তবু এখুনও পটভূমিকা শুরু হয়নি শুধু ভূমিকা। বুঝতে পাচ্ছি না মার্কসের থিওরিতে যাবে কিনা। বুঝতে পাচ্ছি না ধনিক শ্রেণীকে পথে বসাবেন কিনা। তবে তাতে আমার একটু আপত্তি থাকবে। কারণ সামাজিক ব্যবস্থায় ধনিকের আসন একটি বিশিষ্ট স্থানে। ধনী না হ'লে দরিদ্র বাঁচবে কি ক'রে? অবশ্য ওঁর যুক্তি কি হবে জানি না। তবে সে রকম যুক্তি যদি দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তা মানব বৈকি।

—ওঃ আপনি নিজের মতামতও হারিয়ে ফেলবেন ওঁর মতের যৌক্তিকতার কল্যাণে ? হ্যাঁ শুধু উনি কেন, যে কোন শিক্ষিত লোকের যুক্তির আমি একটা মূল্য দিই, তাঁদের যুক্তির ওপর আস্থা রাখা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতের

যুক্তির আমি কোন দাম দিই না কারণ আমার গোড়াগুড়ি থেকেই ধারণা যে তাদের যুক্তির বোনেদ মোটেই দৃঢ় হ'তে পারে না। যাক্ কথায় কথায় আসল কথাটাই গুলিয়ে গেল—পত্রিকার কি করবেন? আমি প্রস্তুত। আপনি সম্পাদক না হন, সহ-সম্পাদক হবেন তো?

— তা হ'তে পারি।

—তাহলে কাজ শুরু ক'রে দেওয়া যাক্। আপনি কাল থেকেই লেখা যোগাড়ে বেরুন। লেখা এসে গেলেই আমি কাগজের এবং ছাপার টাকা দিয়ে দেব। আপনি একটা ভাল প্রেসের ব্যবস্থা দেখুন আর ডিক্লারেশনের জন্তে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিন।

—কালই আমি সব যোগাড় ক'রব। এদিক ওদিক চেনাশুনো মহল থেকে বিজ্ঞাপনও কিছু সংগ্রহ ক'রে আনতে পারব বলে বিশ্বাস আছে।

—বা! তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা! আপনি তো মশাই বেশ কাজের লোক দেখছি।

পরের দিনই শাশ্বতীর বোনঝির জন্মদিন। সন্ধ্যায় ভুবনেশ্বরবাবু যথাসময় অমলাদেবীকে এবং শাশ্বতীকে লইয়া তপতীর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তপতীদের বাড়ী বাড়ী নয়—অট্টালিকা। তপতীর স্বামী সুধীর দত্ত পিতার একমাত্র সন্তান হিসাবে প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে। সুধীরের মা অনেকদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সুধীর ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিলাত হইতে ফিরিলে সুধীরের পিতা তাহার বিবাহ দিয়া এক বৎসরের মাথায়ই গত হন। সুধীর ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় পাশই করিয়াছে, বিলাতী আদপকায়দাই শিখিয়া আসিয়াছে কিন্তু মক্কেলের ক্ষেত্রে ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করিয়া তুলিতে পারে নাই। নেহাৎ গাড়ি আছে, চাপরাশি রাখিবার পয়সা আছে তাই একবার করিয়া বার-এ যায়। তবুও তো লোকে বার-এ্যাট-ল বলে। বাইরের লোকে হয়তো বলে 'ব্রিফলেশ ব্যারিষ্টার' কিন্তু ঘরের লোককে সুধীরের ব্যস্তবাগিস ভাবটা সে কথা বুঝিতে দেওয়ার অবকাশ দেয় না।

সে যাহাই হোক। উৎসবের কোন আয়োজনের ত্রুটি তো হয়ই নাই উপরন্তু আয়োজনের আতিশয্যে চোখ ধাঁধাইয়া যায়। সেই বিরাট অট্টালিকাকে আলোকমালায় সুশোভিত করা হইয়াছে। গীতবাদ্যে মুখর করিয়া রাখা হইয়াছে।

ধনিকশ্রেণী এই সমারোহের তারিফ করিবে, দরিদ্র শ্রেণী ইহাকে ব্যয়-বাহুল্য বলিবে।

তপতী এবং সুধীর দু'জনেই সামাজিক প্রথায় একাধিকবার শাশ্বতীর কাছে ভদ্রতা করিল, আহা এই উৎসবে যদি বেচারা অমিতাভ আসত তাহলে আমরা খুবই খুসী হতাম। ইহাতে শাশ্বতীর বোনের, ভগ্নিপতীর এবং অমিতাভের তিনজনের উপরই রাগে গা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু মাথা হেঁট করিয়া থাকা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না।

বিরাট একটি সুসজ্জিত হল ঘর। অতিথি অভ্যাগতগণের সেইখানেই বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রায় সবাই আসিয়া পড়িয়াছেন, অনিমেষও আসিয়াছে। অনিমেষ ছোটদের উপযোগী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী ও একটি ছোট মিনেকরা আংটী উপহার দিয়াছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সবাই 'হাই সার-কেলের' লোক! তাঁহাদের মধ্যে অনেকে শিশুর সুকামনা করিয়া ছোটখাট বক্তৃতা করিলেন। প্রতিজনের বক্তৃতার শুরুতে শাশ্বতী সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বক্তার পরিচয় করাইয়া দেয়। শাশ্বতী ইচ্ছা করিয়াই সর্বশেষে অনিমেষের সহিত অভ্যাগতদের পরিচয় করাইয়া তাহাকে বক্তৃতা পাঠ করিতে অনুরোধ করিল। অনিমেষ তাহার পকেট হইতে বক্তৃতালিপিটি বাহির করিয়া পড়িতে শুরু করিল—

যে শিশুর জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা এখানে আজ আমন্ত্রিত হ'য়েছি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করি, কামনা করি—তার ভাবীকাল জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হোক, প্রতিভার দীপ্ত কিরণে প্রদীপ্ত হোক তার আগামী জীবন। প্রাচীনেরা বলেন, আকৃতি প্রকৃতি, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য, প্রতিভা পারদর্শিতা নিয়েই জন্মগ্রহণ। কৃষ্টিবানেরা এই মতের সঙ্গে আর খানিকটা তাঁদের নিজের মত সংযোজন ক'রে অভিমত প্রকাশ করেন—এইগুলি শুধুই সহজাত হ'লে চলবে না এর সঙ্গে চাই পরিবেশের সহযোগিতা। আকৃতি প্রকৃতি, প্রতিভা পারদর্শিতা নিয়ে জন্মালেই এইগুলির অধিকার শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখা যায় না; এইগুলি স্ফুরণের জন্যে মিতালি করতে হয় পরিবেশের সঙ্গে। পরিবেশ ভাল হ'লেই পরিশেষ ভাল হয়। পুরুষকার বজ্রনিনাদে ঘোষণা করে—প্রয়োজন নেই এ তর্কের। প্রতিভা সবারই থাকে, তাকে মর্দনের প্রয়োজন। যে কোন শিশুকে প্রতিভাধর করা যায়—শিক্ষা আর চর্চা প্রতিভার অধিকারী করার পক্ষে কার্যকরী। সুপরিবেশ মানেই সুসংরক্ষা। শিশুর নিরাপত্তার দিকে নজর

রাখার সময় কোন ওজর আপত্তিই যেন মাথা চাড়া না দেয়। শুধু দেহের নিরাপত্তা নিরাপত্তাই নয়—দেহের সঙ্গে মনের নিরাপত্তাও একান্তই অপরিহার্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে—রবীন্দ্রনাথই না হয় সুযোগ পেয়েছিলেন থরে থরে শিক্ষা লাভের। কিন্তু সামান্য পিতার সামান্য পরিবেশে মানুষ গদাধর কেমন ক'রে পৃথিবীর অসামান্য হ'লেন? উত্তরে বলতে হয়—ব্যতিক্রম দিয়ে কি কোন উদাহরণ চলে? বর্ণের সঙ্গে পরিচিত না হ'য়েও যে বেদ উপনিষদের অবর্ণনীয় গূঢ় রহস্য তাঁর কণ্ঠে স্রোতস্বিনী নদীর মত প্রবাহিত হ'ত যার ব্যাপ্তি ছিল দিক থেকে দিগন্তে, যার প্রসারতা ছিল পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। অতিমানব আর মহামানবের পার্থক্যটাতো সহজে উড়িয়ে দেওয়ার নয়! পরিবেশের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না কোনমতেই—অতিমানব বা মহামানবের জীবনেতিহাস পর্যালোচনায় সিদ্ধান্তে আসা যায় বৈকি। পরিবেশের অবদান প্রকৃতি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে প্রচেষ্টার আরাধনা। পরিবেশ থেকেই প্রচেষ্টার উদ্ভব, প্রচেষ্টা থেকে প্রতিভার জন্মগ্রহণ। প্রচেষ্টার বিভিন্ন ছাঁচ যেমন সততা, অসততা, বিদ্যা অবিদ্যা, ভালমন্দ। প্রচেষ্টার এই বিভিন্ন ছাঁচ নির্বাচনের দায়িত্ব প্রবৃত্তির ওপর।

পৃথিবীর আলো দেখলেই কি পিতামাতার—কর্তব্য সব শেষ হ'য়ে যায়? 'দেখা' আর 'অবলোকন' এক জিনিষ নয়। দেখালেই চলে না। অবলোকন করানোর দায়িত্বও নিতে হয়। 'বোঝা' আর 'হৃদয়ঙ্গম' কি এক বস্তু? পৃথিবীর অনু-পরমাণুর রহস্য, জীবনবাদের সবিনয় আবেদন বোঝালেই চলবে না, হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে যে।

শিশু লালনার জন্যে পিতামাতাকে সৃজন ক'রতে হ'য় সুপরিবেশের। সেই পরিবেশ থেকেই পিতামাতার কাছে প্রচেষ্টা এসে ধরা দেয়। এই থেকেই শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে উঠতে পারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে। অনেক সময় মেয়ে অবহেলিত হয় পিতামাতার কাছে, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় মেয়েরা তাদের গুরুজনের কাছ থেকে। শিক্ষা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপই সর্বস্ব নয়—মনের শিক্ষা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, আচার ব্যবহারের শিক্ষাটাই আগে, এ শিক্ষার অভাব বলেই তো আজ কথায় কথায় বঞ্চনা এসে মেয়েদের ব্যঙ্গ করে। মনীষী গঠনের তৃপ্তির মত মনীষা গঠনেও তো তৃপ্তি আছে। বরঞ্চ আজকের যে যুগে পৃথিবীর সমগ্র স্ত্রী-জাতি দিকভ্রান্ত ঠিক সেই যুগে একটি

কষ্টারঞ্জ লাভ করা আনন্দের বৈকি। কারণ একটা তীব্র এষণা নিয়ে প্রচেষ্টার এমন একটা ছাঁচে তাকে ঢালাই করার প্রয়াস পাওয়া যায় যাতে ক'রে পৃথিবীর এই রকম প্রয়োজনীয় জাতটা অনাদর আর প্রবঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্তে আর একটা অবলম্বন পায় আর একটা উদাহরণ পায়।

সকলেই উচ্চ প্রশংসা করিল এই বক্তৃতার। অনেকে অভিভূতও হইয়া পড়িয়াছিলেন। তারপর আহারান্তে সেদিনের মত উৎসব শেষ হইল।

(৬)

অমিতাভকে দশটা-পাঁচটা কিরূপভাবে কেরাণী জীবন যাপন করিতে হয় তাহার বিবরণও একটু দিতে হয়।

অমিতাভকে 'নিউকামার' পাইয়া কেরাণীকুল যে তাহার পিছনে লাগিবে এ আর এমন নূতন কি? প্রায় সব আগন্তুক কেরাণীর ভাগ্যে যা জোটে অমিতাভের ভাগ্যেও তার অন্যথা ঘটে নাই। আগন্তুক কেরাণী সহকর্মীদের চক্ষুশূল। যাঁহারা কেরাণীগিরি করেন তাঁহারা হাড়ে হাড়ে এই চিরন্তন সত্যটি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন। চক্ষুশূল হইবার কারণও আছে যথেষ্ট। সবগুলি কারণ বিবৃত না করিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকটি বিবৃত করিলেও বোধকরি যাঁহারা কেরাণীগিরি করার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই তাঁহারা আঁচ করিয়া লইতে পারিবেন। কারণগুলির মধ্যে ১ম নম্বর আগন্তুকের আগমনে সহকর্মীদের 'ওভার টাইম' বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ২য় নম্বর আগন্তুক যদি অন্যান্য সহকর্মী অপেক্ষা 'কমপিটেণ্ট' হয় তাহা হইলে স্বভাবতই সহকর্মীদের নানানদিক দিয়া সম্মানে লাগিতে পারে। ৩য় নম্বর—আর একটা ভয়—আগন্তুক যদি দক্ষতার পরিচয় দেয় তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ আগন্তুকের নজির দেখাইয়া অন্যান্য কর্মচারীদের অধিকতর পরিশ্রম করাইয়া লইতে পারে। ৪র্থ নম্বর—যদি কোন উপায় উপরি রোজগারের ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে নবজাতক ভাগ বসাইতে পারে অথবা কৃতিত্ব লাভ করিবার আশায় ঠ্যাকাঠ্যি করিয়া কর্তৃপক্ষের কাছে সেই সব অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলিয়া দিয়া তাহাদের কুসুমাস্তৃত পথকে অকস্মাৎ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। এই এই রকম ধরণের কত কিই কারণ থাকে! কেরাণীর জীবন গ্রহণ করিয়া প্রথমে

পরিবেশকে বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। তারপর উক্ত পরিবেশের সহিত নিজেকে সতর্কতার সহিত খাপ খাওয়াইবার পালা আসে। যিনি খাপ খাওয়াইতে পারেন না তাঁহাকে খাবি খাইতে হয়। তবে হ্যাঁ, যদি মালিকের (মার্চেন্ট অফিস হইলে), বড়বাবুর বা উপরিওলার যে কেহর আত্মীয় টাত্মীয় গোছের কিছু হওয়া যায় তাহা হইলে কুচ পরোয়া নেই। 'ব্রেন কনেকসন' গোছের অথবা 'সইএর বউএর বকুল ফুলের বোনপো ঝিএর বোনপো জামাই' গোছের কিছু একটা সম্পর্ক থাকিলেই ব্যস একেবারে মাৎ। খুঁটির জোরে ঘুঁটি ঠিকই লড়িবে তাহা হইলে। উপরওলার সঙ্গে যথেষ্ট খাতির আছে—কোন অছিলায় একবার বিশ্বাস করানো যায় যদি এই কথাটা তাহলে একদম যাহাকে বলে কেল্লাফতে। এই রকমটি হইলে শ্রেফ এঁদের 'থোড়াই কেয়ার' তো বটেই উপরন্তু মাথায় পা দিয়াও হাঁটা যায়।

অমিতাভ যখন আগন্তুক এবং তাহার যখন নিতান্ত দরখাস্ত দিয়া চাকুরী তখন তাহাকে নানান বিপদ আপদের মধ্যে দিয়া যাইতে হইবে এতে আর আশ্চর্য কি।

একদিন বেলা দ্বিপ্রহরে কলেজের একটা লেকচার শেষ করিয়া অমরনাথ অমিতাভের অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল। অমিতাভের অফিসে আসা অমরনাথের এই প্রথম। অমরনাথকে দেখিয়া অমিতাভ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। অমরনাথ অমিতাভের পাশের একটি চেয়ার খালি দেখিয়া সেখানে বসিয়া পড়িয়া কহিল, কিরে—আশ্চর্য হচ্ছিস যে?

অমিতাভ কহিল, না ঠিক আশ্চর্য হচ্ছি না, তবে কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ হচ্ছে। তুই হঠাৎ এখন এখানে? কিছু একটা হ'য়েচে নিশ্চয়ই।

—কিছু একটা হ'য়েচে তো নিশ্চয়ই, শোন্ অনিমেষ এসে নাছোড়বান্দা, বলচে তোর উপন্যাসটা—শেষ করিতে না দিয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া চুপ করিতে ইসারা করিল অমিতাভ। অনিমেষ বুঝিয়া গলাটা একটু নামাইয়া কহিল, মানে তোর ওটা ও নিতে চায়।

—অনিমেষ নিয়ে কি করবে?

—যে ভদ্রমহিলার বোনঝির জন্মদিন উপলক্ষে তুই একটা বক্তৃতা লিখে দিলি তিনি আর অনিমেষ দু'জনে মিলে একটা কাগজ বার ক'রচেন—নাম মাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ঐ কাগজটায় ছাপবার জন্যে। বলচে, যে কাগজে বেরুচ্ছে তার ডবল টাকা দেবে। ভদ্র মহিলাই খরচ পত্তর সব দিচ্ছেন।

প্রচুর টাকা আছে নাকি। যেমন ক'রেই হোক কাগজটাকে দাঁড় করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে গেল অনিমেষ। অনিমেষকেই নাকি ভদ্রমহিলা সম্পাদক হওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি ক'রেছিলেন, অনিমেষ রাজী হয়নি বলে নিজেই সম্পাদিকা হ'য়েছেন উনি। অনিমেষ হ'য়েছে সহ-সম্পাদক। এই দেখ্ অফিসিয়েল কায়দায় অনুরোধ নিয়ে এসেছিল অনিমেষ—বলিয়া একটা লেটার হেড প্যাড এ লিখিত একটি চিঠি অমিতাভের হাতে দিল। অমিতাভ চিঠি পড়িয়া দেখিল, তাহাতে লেখা আছে—

পরম শ্রদ্ধেয় অমরনাথ বাবু,

আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আপনার লেখার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় আছে। আমাদের কাগজের জন্য আপনার উপন্যাসের অবশিষ্ট অংশ যদি দেন তাহলে সবিনয় নিবেদন করছি যে ওর জন্যে যে পত্রিকায় বর্তমানে ছাপা হ'চ্ছে তার দ্বিগুণ আমরা দেব।

যেমন ক'রেই হোক আমাদের কাগজটাকে যদি একটু সাহায্য করেন তাহলে আমরা বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের কিছু উপকারে লাগবার সুযোগ পাব।

নমস্কারান্তে

ইতি—

শাশ্বতী মিত্র

অমিতাভ এই চিঠিখানির তলায় নাম এবং লেটার হেড প্যাডের ঠিকানা দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু অচিরেই নিজেকে সংযত করিয়া হাসিয়া কহিল, তা এর জন্যে আমার কাছে ছুটে এলি কেন? এর উত্তরটা তুই ও তো দিতে পার্তিস। এ তো সাধারণ কথা। এক জনের সঙ্গে যখন চুক্তিবদ্ধে আবদ্ধ হওয়া গেছে তখন কেমন ক'রে আর এক জনকে দিবি বল্। টাকার লোভে এক জনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবি।

অনিমেষ কহিল, আরে বাবা সেই জন্যেই তো তোর মতামত নিতে এলুম।

—তার চেয়ে বল্ যে অন্য লেখা বরাবরই দেওয়া যেতে পারে। তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। তবে নতুন কাগজ পাঠক সংখ্যা কম, তাহলেও অনিমেষের জন্য না-হয় ওটা করা যাবে। আর টাকা ও দিতে হবে না তার জন্যে কারণ এর ভেতর যখন অনিমেষও আছে। অমিমেষের সঙ্গে তো আজকের পরিচয় নয়।

অমিতাভের ডিপার্টমেন্টের দু'একটি লোক অমরনাথকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের মনে একটু ঈর্ষ্যাই হইতেছিল। উদীয়মান একজন সাহিত্যিকের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল অমিতাভের! শুধু পরিচয় নয় একেবারে তুই তুকারী! মহা আশ্চর্য হইয়া যায় তাহারা। অমরনাথের সুমুখে অমিতাভকে একটু অপমানিত করিবার অভিপ্রায় তাহাদের মধ্যে একজন টুক করিয়া বড়বাবুকে নালিশ করিয়া দেয় যে, অমিতাভ বন্ধুর সহিত অফিসে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া নিজের কাজের তো ক্ষতি করিতেছেই, তাহাদেরও বিরক্ত বোধ হইতেছে। বড়বাবু সেই ঘরের মধ্যেই একটি কাঠের পার্টিশনকরা চেম্বারের ভিতর বসেন। বেয়ারা দিয়া অমিতাভকে ডাকাইয়া কহিলেন, কোম্পানী আপনাকে মাইনে দেয় কোম্পানীর কাজ করার জন্যে, বন্ধু নিয়ে এসে তার সঙ্গে আড্ডা মারবার জন্যে নিশ্চয়ই আপনার বেতন ধার্য হয়নি। মনে রাখবেন অফিসটা ড্রইংরুম নয়। কাজে বসুন গিয়ে।

অমিতাভ অনত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, আত্মীয় পরিজন দৈবাৎ অফিসে এলে তার সঙ্গে দু'টো কথা বললে অফিসটাকে ড্রইংরুম বানিয়ে দেওয়া হয় বলে জানতাম না, আজ জানলাম। সৌজন্য বোধটা পৃথিবী থেকে উধাও হয়নি বলেই জানতাম, আজ দেখচি আমার জানারই ব্যতিক্রম হ'য়েচে।

বড়বাবু উত্তেজিত ভাবে কহিলেন—সাট্ আপ! যান এখান থেকে, এর একটা বিহিত আমি করবই!

অমিতাভ বড়বাবুর চেম্বার হইতে বাহির হইয়া পুনরায় নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল।

বলাবাহুল্য অমরনাথ সেইসব কথা শুনিয়াছিল, কাতরভাবে কহিল, ছেড়ে দে অমিতাভ এ চাকরী। এখন আর তোর কিসের দরকার এ ক্রীতদাসের চাকরী?

অমিতাভ স্মিতহাসে বলিল, বড্ড উত্তেজিত হ'য়ে পড়েচিস, অমরনাথ; হওয়ারও কথা, অভ্যাস নেই যে তোর। আমার হ'য়ে গেছে রে। ঠিক আমার মতই কত কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীতে এইভাবে অপমানিত হ'চ্ছে, পারিস তাদের সবাইকে এই ক্রীতদাসের চাকরী থেকে ছাড়িয়ে আনতে? স্তব্ধ হইয়া যায় অমরনাথ, বিদায় লইয়া চলিয়া যায় ও। আরও অনেক কথাই অমিতাভ বলিয়াছিল তাহার অর্দ্ধেক তাহার কানে গেল অর্দ্ধেক গেল না। সে শুধু আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিল—কি অদ্ভুত মানুষ এই অমিতাভ!

বড়বাবু রাখহরি ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বেশ করিয়া রং চাপাইয়া দীর্ঘ করিয়া একটি অভিযোগ পত্র লিখিয়া মালিকের নিকট পাঠাইয়া দেন। সবাই জানিত রাখহরিবাবুও জানিতেন ইহা রাতারাতিই ক্রিয়া করিবে না। ইহার ব্যবস্থা হইতে বেশ কিছুদিন সময় লাগিবে।

একদিন নবীনবাবু, উপেনবাবু, জগদীশবাবু প্রভৃতি কর্মচারিবৃন্দ যাঁহারা নিজেদের মালিকের আত্মীয়, মালিকের পিতৃবন্ধুর শ্যালক প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহারা বড়বাবুর নিকট গিয়া নালিশ করিলেন, আমাদের ওপর কাজের ভয়নক চাপ পড়ছে। অত কাজ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। অমিতাভবাবু প্রায়ই বসে থাকেন, খবরের কাগজ পড়েন, ওঁকেও আমাদের কাজের কিছু অংশ দেওয়া হোক্।

সঙ্গে সঙ্গেই রাখহরিবাবু অমিতাভকে ডাকাইয়া বলেন, অমিতাভ বাবু, আপনি অফিসে কাগজ পড়েন কেন? আপনার কাজ হ'য়ে গেলে আপনার অন্যান্য সহ-কর্মীদের সাহায্য ক'রবেন। কলিগ হ'য়ে এটুকু পারেন না, ছি ছি! যান এখন।

অমিতাভ দাঁড়াইয়া থাকে, যথাসম্ভব বিনীত হইয়া বলে, অফিসে কাগজ পড়ার ফুরসৎ তো বড় একটা পাই না। ক্যাশের সব কাজ করি তাছাড়া সমস্ত ভাউচার গুলো লিখি, তার ওপর যদি······। মুখের কথা মুখেই থাকিয়া যায়। শেষ করিতে দেন না বড়বাবু।

—কোন কথা শুনতে চাই না। আপনি মুখের ওপর কথা বলচেন, তর্ক করচেন? আপনার কি কাজ আছে না আছে আমি তা জানি কারণ আমিই এলটমেণ্ট ক'রেচি কাজের। কলিগদের একটু সাহায্য করতে হবে বলে এত কথা বলচেন? আপনার যা কাজ আছে তা করবেন প্লাস ওদের সাহায্য করবেন, বুঝলেন? যান্।

ওপরওলার সঙ্গে তর্ক করা অফিসের নিয়ম নয়। অমিতাভ নিয়মানুবর্তিতা জানে বৈকি। তাই সে এক প্রকার নত মুখেই চলিয়া যায়।

একদিন নবীন বাবুকে খোদ কর্তা ডাকিয়া পাঠান। সকলেই সমীহভরে তাকান তাঁহার দিকে, মায় বড়বাবু পর্যন্ত। নবীনবাবু বলেন যে, তিনি মালিকের ভগ্নির পিসতুত দেওর। মালিকের ঘরে গিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন তিনি, আমায় আপনি ডেকেছেন, স্যার?

অপূর্ববাবু টেবিলের কাগজ পত্রের উপর মুখ রাখিয়া কি সই সাবুদ করিতেছিলেন, নবীন বাবুর দিকে না তাকাইয়া কলম চালাইতে চালাইতে গম্ভীর স্বরে কহিলেন, হ্যাঁ তোমাকে ডেকেচি। প্রায়ই দেখি তুমি এগারোটা বারটার সময় আস, অফিসে আসতে তোমার এত দেরী হয় কেন? ভেবনা, তুমি আত্মীয় বলে তোমায় আমি কিছু বলব না। এটা অফিস তা যেন ভবিষ্যতে খেয়াল থাকে, বুঝলে? যাও।

নবীনবাবু মেরুদণ্ড ঋজু করিয়া প্রায় কুর্ণিশ করার মত করিয়া বলিলেন, আজ্ঞে, আর দেরী হবে না।

—আচ্ছা যাও। গুরু-গম্ভীর উত্তর আসিল মালিকের কাছ থেকে।

নবীনবাবু ডিপার্টমেণ্টে ফিরিয়া আসিলে সকলেই এক ধার থেকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন তাঁহার দিকে। কাউর সাহসে কুলাইল না কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে। শুধু তাকাইল না একজন, বলাবাহুল্য সেজন অমিতাভ ছাড়া আর কেহই নয়। সে তাহার নিজের কাজ লইয়াই ব্যস্ত রহিল। নবীনবাবু একেবারে সোজা বড়বাবুর ঘরে গিয়া সডাকে বলিলেন, দেখুন না আত্মীয় হ'লেও জ্বালা! অপূর্বদা বললেন, অনেকদিন বোনটাকে দেখিনি, আজকে একবার নিয়ে আসবেন দিকিনি, বাড়ীতে বলে আসবেন আজ আমাদের ওখানেই আপনি খাবেন। খুব ক্ষতি হ'য়ে যাবে না তো? না হয় আজ রাত্রে ব্যাডমিণ্টন খেলাটাই হবে না। তা আমার জন্যে এইটুকু স্বার্থ-ত্যাগ ক'রতে পারবেন না? দেখুন না, আমিই যেতুম কিন্তু কি জানেন আমি গেলে আপনি আসবেন না। বলবেন, বোনকে যখন আপনিই নিয়ে যাচ্চেন তখন আমি আর একদিন যাব খ'ন। নবীনবাবু বয়সে প্রবীণ হইলেও আদপ-কায়দায় নবীন হইয়া থাকিতে চেষ্টা করেন। এই কথাগুলো বলিয়া তিনি এমন একটা কায়দায় মনের ভাব প্রকাশ করিলেন যেন তিনি বিরক্ত মালিকের সহিত আত্মীয়তার সূত্র আছে বলিয়া। কিন্তু গর্বের স্ফীত প্রবাহটা তাঁহার কথার ভেতর যে বহিল না তাহা নয়। বড়বাবু মনে মনে ভাবিলেন, বাবা! এই রকম আত্মীয় আমি যদি হতুম তাহলে তো বেঁচে যেতুম।

নবীনবাবু পুনরায় বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ আমি প্রসঙ্গক্রমে বলতে ছাড়িনি মাইনের কথাটা। বললুম, মাইনে-পত্তরের দিকে একটু নজর দিন। বলতে অপূর্বদা বললেন, বেশতো বেশী এক্সট্রা ক'রে পুষিয়ে নিন না।

বড়বাবু আমতা-আমতা করিয়া কহিলেন, ঠিক আছে, উনি যখন বলেচেন, তখন আপনাকে কম এক্সট্রা ক'রতে বলার সাধ্যি আমার আছে? তবে কি জানেন উনি আবার আমায় এক্সট্রা লোক বার ক'রতে নিষেধ করেন, তা ঠিক আছে আপনাকে যখন বলে দিয়েছেন....

নবীনবাবু বেকায়দায় পড়ার লোক নন, বড়বাবুর কাছে একটু ঘেঁসিয়া চুপি চুপি বলার মতন করিয়া বলেন, ওটা আর কিছুই নয়, লোক দেখানো বুঝলেন তো! জানাতে চান এক্সট্রা দেওয়াটা উনি পছন্দ করেন না। বলতে পারেন না তো অমুক লোককে এক্সট্রা দিন, তাহলে কে আবার ভাববে, দেখ—টেপটিজম ক'রচে! মুখে উনি যাই বলুন, আসলে ওঁর মনের ইচ্ছে আমি যাতে দু'টো পয়সা পাই! যতই হোক আত্মীয় তো।

তা তো ঠিক, তাতো ঠিক, বড়বাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

—হ্যাঁ, আরও একটা কথা বলেচেন, সেটা অমিতাভবাবুর সম্বন্ধে; বলিয়া দরজার ফাঁক দিয়া একবার অমিতাভকে দেখিয়া লইলেন। সে কথা অমিতাভের কান পর্যন্ত পৌঁছিল বটে কিন্তু কানের ভিতর বোধ করি প্রবেশ করিল না। নবীন বাবু বলিয়া যাইতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন—লোকটা কাজটাজ ঠিকমত করে তো? আমি ও অনেক সময় দেখি কি কবি কবির মত ভাবে, কাগজ পড়ে। আমি আর কি বলি, হাজার হোক 'কলিগ' তো গাঁইগুঁই করতে লাগলাম।

পরের দিন হইতে নবীনবাবু দশটার সময় আসিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় পরিবর্তনে সকলের মনে বিস্ময় জাগিয়াছিল বৈকি। কয়েকজনের বিনীত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বেশ খানিকটা মুরুব্বিআনা চালে বলিয়াছিলেন, কাজ ক'রতে ক'রতে কাজের নেশা হ'য়ে গেছে তাছাড়া অপূর্বদা যখন কয়েকজনকে চোখে চোখে রাখতে বলেচেন তখন তো তাড়াতাড়ি আসতেই হবে। একজনকে চোখে রাখিতে বলিলে কোন কথা ছিল না কিন্তু নবীনবাবুর বহুবচন ব্যবহারে অনেকের মনই যেন কিরকম একটা অজানা শঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

মালিক অপূর্ববাবু যে উপেনবাবুর পরিবারের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত একথা জাহির করিবার জন্য উপেনবাবু সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। মনিবের সহিত তাঁহার পরিবারের এতই ঘনিষ্ঠতা যে মনিবকেও তাঁহাদের বাড়ীতে প্রয়োজনবোধে আসিতে হয়—এই কথা সকলকে জানাইবার উদ্দেশ্যে নানানরকম

গৌরচন্দ্রিকা করিয়া একদিন একটি ঘটনা বিবৃত করিলেন। উপেনবাবু প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া বৃদ্ধত্বের রেখায় পড় পড় হইয়াছেন।

সেদিন উপেনবাবু একরূপ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া তাঁহার একজন সহকর্মীকে বলিতে লাগিলেন ঠিক বড়বাবুর ঘরের পাশটিতে দাঁড়াইয়া, হেঁ হেঁ বাবা! আজ চাকরকে বলে দিয়ে এসেছি, ঘরের ধূলো যদি জমে পাহাড়ও হ'য়ে যায় তাহলেও ফেলবি না, ওগুলো বাক্সের ভেতর রেখে দিবি।

সহকর্মীটি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কেন?

উপেনবাবু আনন্দে আটখানা হইয়া বলিলেন, হেঁ হেঁ বাবা! মালিক অপূর্বমোহন আজ আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন! জামাইবাবুর সঙ্গে কি একটা পারসোনাল দরকার ছিল কিনা তাই। জামাইবাবু একেবারে বুড়ো হ'য়ে গেছেন, বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তবু কি লোকের যাওয়া আসা বন্ধ আছে! অপূর্ববাবু কেন আরও কত রথী মহারথীকেই আসতে হয় জামাইবাবুর কাছে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে। ভাল আইনজ্ঞ ছিলেন তো! দিদিকে কত বলি, তোমার ভাজকে না হয় নিয়ে আসি দেশ থেকে, তোমার কিছু কাজকর্মের সাহায্য হবে। দিদির ঐ এক গোঁ—না তোর বউকে আর কষ্ট করতে হবে না!

এইসব কথাবার্তা শুনিয়া বড়বাবু ডাকিলেন, ওঃ উপেনবাবু।

—যাই স্যার। বলিয়া উপেনবাবু রাখহরিবাবুর ঘরে ঢুকিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, যাক্ ওষুধ ধরেচে!

বড়বাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কহিলেন, কি ব্যাপার, মশাই! মালিক যে আজ আপনার বাড়ীতে গিয়েছিলেন বলছিলেন আপনি! উপেনবাবু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জানাইলেন যে তাঁহার ভগ্নিপতীর সহিত কি একটা ব্যক্তিগত দরকার ছিল। বড়বাবু মনে মনে ভাবিলেন, বাবা! এদের সঙ্গে চালাকি নয়, যা কিছু কাজটাজ ঐ অমিতাভের মত অনাত্মীয় নূতন লোককে দিয়েই করানো ভাল।

অতএব দিনেরপর দিন কাজের বোঝা চাপিতে লাগিল অমিতাভের উপর।



(৭)

চারমাস কাটিয়া গিয়াছে। 'অমরনাথে'র উপন্যাস লইয়া চারিদিকে রীতিমত হৈ হৈ পড়িয়া গিয়াছে। মাসিক পত্রিকায় শেষের দু'একটি অধ্যায় প্রকাশ হইতে যখন বাকী তখন হইতেই প্রকাশকেরা অমরনাথের বাড়ী ধর্ণা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন ভাল প্রকাশকের প্রকাশনায়ই উপন্যাসটি গ্রন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

অমরনাথের অনুরোধে অমিতাভ হোষ্টেল ছাড়িয়া একটি বাসা ভাড়া করিয়াছে। বাসাটি মন্দও নয়। একটি ছোট্ট একতলা বাড়ী। ভাড়া পঞ্চাশ টাকা। রাতদিনের একটি বুড়া পাচক বহাল হইয়াছে। একটি চাকরও অমিতাভ রাখিতে গিয়াছিল কিন্তু পাচক রামচন্দ্র মাইতি সবিনয় বলিয়াছিল, বাবু দু'টোতো লোক। আবার একটা লোক শুধাশুধি রাখতে যাবেন কেন, আমিই বাসুন-কুসুন যা দু'চারটে হবে তা মেজে ফেলব। আর আপনার বিছানা করা, ঘর পরিষ্কার করা? ওগুলো আমি খুব ক'রতে পারব। আপনি ছাড়া একটা লোকও তো আমায় রাখতে চাইল না আমার পৈতে নেই শুনে। আপনি আমার পৈতেও দেখতে চাইলেন না, কি জাত তাও শুধালেন না। শুধু রাঁধতে জানি শুনেই আমায় রাখতে চাইছেন—কত বড় বিপদ থেকে যে আমায় বাঁচালেন তা আমি জানি আর আমার ভগবান জানেন। একটা হোটেল থেকেই রান্নার কাজ শিখি। কিন্তু সেই হোটেলের আর একটা ঠাকুর জিনিষ পত্তর চুরি ক'রত। বাবুরা সন্দেহ ক'রল আমাকেও। রাগে আমি সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছি, প্রতিজ্ঞা করেছি ভবিষ্যতে আর কোনদিন এমন হোটেলে বা বাড়ীতে চাকরী করব না যেখানে আর একজন ঠাকুর আছে। আপনি আমার যে দয়া করলেন তা কখন ও ভুলব না। দেশে আমার বৌ ছেলে অনাহার থেকে বাঁচবে এবার। রামচরণের দেশ কাটোয়ায়, কিন্তু শিশুকাল হইতেই কলিকাতার আবহাওয়ায় মানুষ বলি বেশ মার্জিত বাংলায়

কথাবার্তা বলিতে পারে, মাঝে মাঝে দু'একটা যা দেশী ভাষা বাহির হইয়া পড়ে। খাওয়া পরা ছাড়া ২০ টাকা মাহিনা ধার্য করিতে রামচন্দ্র গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে রাজী হইয়াছিল। রামচন্দ্রের এই সকল কথা শুনিয়া অমিতাভ আরো পাঁচ টাকা বাড়াইয়া ২৫ টাকা ধার্য করিয়াছিল তাহার বেতন।

অমিতাভের কেরাণীর চাকুরী টিঁকিয়াই আছে। চাকুরী রাখিবারও চেষ্টা করে নাই, ছাড়িবারও চেষ্টা করে নাই। রাখহরিবাবুর অভিযোগে মালিক অমিতাভকে ডাকাইয়া ঘটনা বিবৃত করিতে বলিলে অমিতাভ সেদিনের হুবহু ঘটনাটি বলিয়া গিয়াছিল।

অপূর্ববাবু বুঝিয়াছিলেন—রাখহরিবাবুর রাগটা অমিতাভের উপর কি জন্য। সেদিনকার সেই ব্যাপার তো বটেই তাহা ছাড়া গ্রস টোটালটার ব্যাপারটাও রাখহরিবাবুর রাগের উদ্রেক ঘটাইয়াছে। অথচ গ্রসটোটালের ব্যাপারটার জন্য অমিতাভ মোটেই দায়ী ছিল না, সে মোটেই মালিকের কাছে ঐটি পাঠায় নাই। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, অমিতাভ একটা গ্রস টোটাল করিয়া রাখহরিবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাখহরিবাবু তাহা দেখিয়া পাশে নোট দিয়াছিলেন ঠিক হয় নাই। অমিতাভ স্থির করিয়াছিল পরের দিন আরও একবার কষিয়া দেখিবে। কিন্তু পরের দিন বেয়ারা মালিককে দিয়া 'পাশ' করাইবার জন্য যেসব ভাউচার ছিল সেগুলির সঙ্গে যোগকরা ঐ কাগজটাও ভুল করিয়া লইয়া যায়। ভাউচারগুলো দেখা হইয়া গেলে মালিকের নজর পড়িল ঐ গ্রসটোটালটার উপর। তিনি সেটি নিজে কষে দেখিলেন ঠিকই আছে। তিনি দেখিলেন অমিতাভের সই রহিয়াছে এবং রাখহরিবাবুর 'নোট' রহিয়াছে, বুঝিয়া লইলেন ব্যাপারটা সবই। বাধ্য হইয়া রাখহরিবাবুকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, এটা আমার কাছে আসার কথা নয়, বেয়ার ভুল করে এনে ফেলেচে। আমি ওটা দেখলাম। কিরকম চেক্ করেচেন? ওটা তো ভুল যাইনি, কাজে মন দেবেন। রাখহরিবাবুর সমস্ত রাগ গিয়া পড়িয়াছিল অমিতাভের উপর।

মালিক অপূর্বমোহন শীল রাখহরিবাবুর অভিযোগপত্র পাইয়া অমিতাভকে কিছু বলিলেন না, রাখহরিবাবুকেও কিছু বলিলেন না। অমিতাভ নির্দোষী সেই কারণে তাহাকে কিছু বলেন নাই, রাখহরিবাবু তাঁহার পিতার নিযুক্ত লোক ও বয়োবৃদ্ধ তাই তাঁহাকেও কিছু বলিতে পারেন নাই।

মাসিক সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প দিতে হয়। সকলের কাছে বিশেষ করিয়া শাশ্বতীর কাছে এইভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকাটা বেশ ভালই লাগিতেছিল অমিতাভের।

এই চার মাসে অমিতাভ বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। চার মাসের আটটা রবিবার সে এই ব্যাপারে সদ্ব্যবহার করিয়াছে। শনিবার যাত্রা করিয়াছে সোমবার ফিরিয়া আসিয়াছে। কৃষক-মজদুর, সাঁওতাল, খনির শ্রমিক প্রভৃতি আজন্ম দুঃখী জাতগুলোর মর্মভেদী অব্যক্ত যন্ত্রণা আর একবার সে নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে।

কলিকাতার কম বস্তী সে এই চার মাসে ঘোরে নাই। এই চার মাসের প্রথম মাসটি ছিল শ্রাবণ মাস। বর্ষার ভিতর বর্ষাতি না লইয়া সে বস্তী-বস্তীতে ঘুরিয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রাবণ মাসটি সে বস্তী ঘোরার ব্যাপারে কাজে লাগাইয়াছিল। তাহাদের জীবন কথা জানিতে আসিয়াছে বলিলে তাহাদের মধ্যে অনেকে কি ভাবিতে পারে অথবা অনেকে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে পারে, তাই বৃষ্টির অজুহাতে সোজাসুজি বস্তীর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বস্তী-বাসীর সকরুণ ঘর-সংসারকে, তাহাদের নিদারুণ অশিক্ষাকে, তাহাদের আমরণ দৈন্যকে অমিতাভ আর একবার প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছে।

এই চার মাসে অমরনাথ শাশ্বতীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। শাশ্বতী পত্রিকার ব্যাপারে কোন উপদেশ চাহিলে অমরনাথ ভাবিবার একদিন সময় চায়। বলাবাহুল্য সে নিজে বাড়ীতে গিয়া ভাবিতে বসে না। সোজা অমিতাভের কাছে আসিয়া ভাবনার বোঝা ফেলিয়া দিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচে। তারপর যথাসময় অমিতাভের কাছ থেকে উপদেশের বোঝা লইয়া তাহা শাশ্বতীর কাছে লইয়া ফেলে। শাশ্বতী উদাত্তকণ্ঠে প্রশংসা করে সেই সকল উপদেশের। পত্রিকাটিকে দাঁড় করাইবার জন্য শাশ্বতী অমরনাথকে একান্তভাবে অনুরোধ করে। অমরনাথ শাশ্বতীর সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না।

একদিন শাশ্বতী একথা ও কথার পর অমরনাথের উপন্যাসের প্রসঙ্গ তোলে। শাশ্বতী অমরনাথকে বলিয়াছিল, দেখুন অমরনাথবাবু, আপনি কিন্তু ধনিক শ্রেণীদের ওপর বড়ই অবিচার করেছেন আপনার উপন্যাসে। আপনার যুক্তি-গুলো অবশ্য অখণ্ডনীয়। আচ্ছা, দরিদ্রের ওপর ধনীদের যে নির্যাতনের কথা আপনি আপনার উপন্যাসের শেষের অধ্যায়গুলোয় লিখেছেন সেগুলো কি ঠিক? বাস্তবে কি এতখানি চরম হয়?

অমরনাথ বলিয়াছিল, দেখুন শাশ্বতীদেবী, জীবনকে আপনি আর কতটুকু প্রত্যক্ষ করেচেন, কতটুকু সুযোগ আর আপনার অদৃষ্টে ঘটেচে। আপনি ধনীর দুলালী। পৃথিবীর এই দিকটার দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ আপনার জীবনে আসেনি, প্রয়োজনও হয়নি। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর অসভ্যতা আজ সীমা লঙ্ঘন করতে চলেছে। মনে রাখবেন দয়া করে, আমি কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে চাইচি না। কথাটা আপনি তুললেন বলে আমায় বলতে হ'চ্ছে। ঐ শ্রেণীটা অর্থের ভাগ-বাঁটোয়ারা এমনভাবে করচেন, এমনভাবে দূষিত-স্বভাবের বীজ মানুষের ভেতর বপন ক'রেচেন যার জন্যে শান্তিকে আর কিছুতেই আজ অব্যাহত রাখা যাচ্ছে না। এই দেখুন না, সেদিন আমার এক বন্ধুর অফিসে গিয়েছিলাম, সেখানে কেরাণীদের ভেতর যে হীনতার রূপ দেখে এলাম তা দেখে তখনি একটা বিপ্লব করার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি রেগে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু আমায় প্রশমিত করে বললে, দোষ তো ওদের নেই অমরনাথ। দোষ হ'চ্ছে যাঁরা এই কাঠামো তৈরী করেচেন তাঁদের। আমাদের যিনি অন্নদাতা তিনি কি আর কিছুই দেখেন না, না কিছুই বোঝেন না। সবই দেখেন সবই বোঝেন, লোকও কিছু খারাপ নন, তবে পুরুষানুক্রমিক উদাসীনতার প্রভাবটাকে বর্জন করতে পারেন নি আজও। দোষটা এদের নয়, দোষটা মালিকদেরও নয় দোষটা বোনেদের।

—বন্ধুটি কে? শাশ্বতীর মুখ দিয়ে অকস্মাৎ প্রশ্নটি বাহির হইয়া আসে। তাহার বুকের ভেতরটা ধ্বক ধ্বক করে।

অমরনাথ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া বলিয়াছিল,—তাকে আপনি চিনবেন না। তাকে কেউ চেনে না, তাকে কেউ জানে না। কারুর কাছে নিজেকে চেনা দেয় না সে। তার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—সে এক অদ্ভুত। সে কেরাণীগিরি করে, সে সে বস্তীতে বস্তীতে ঘুরে বেড়ায়; গঙ্গারধারে, পার্কে গিয়ে বসে থাকে। বলা নেই কওয়া নেই মাঝে মাঝে হঠাৎ বাইরে বেড়াতে যায় একলাটি। তার নিজের একটা সত্তা আছে। তার সে সত্তা আমি চুরি করে দেখেছি, সে কাউকেই তা দেখায় না। পৃথিবীর অনেক কিছু সে জেনেছে, অনেক কিছু সে দেখেছে। সবরকমের অভিজ্ঞতার ভেতরই আছে জীবনের পরিপূর্ণতা একথা সে বিশ্বাস করে। সে এই ধনীদের সম্পর্কে কি বলে জানেন? বলে, মানুষ বলতে আমি

তাদেরই বুঝি যাদের ভেতর আছে মনুষ্য চেতনা। একদল লোক এই বোধশক্তির, এই চেতনা শক্তির বিনষ্টি চাইছে। তারা পৃথিবীর কাছে ধনিক শ্রেণী বলে পরিচিত, আমার কাছে তারা সর্বগ্রাসী বলে পর্যবসিত। তারা তাদের অধিকারকেই বড় করে দেখে, মানুষের অধিকারকে আমল দেয় না। নিজেদেরকে যে তারা বড় লোক বলে গণ্য করে, বাকী লোককে তারা ছোটলোক বলে আখ্যায়িত করে। অমরনাথ একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, সে আরো বলে। মানুষকে অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত ক'রেছে, মানুষের বৈচিত্র্য যারা নষ্ট করেছে, মানুষের ভোগকে যারা দুর্ভোগ করে তুলেছে, যাদের জন্যে পৃথিবীর শান্তি হয়েছে ব্যাহত তাদের আমি বিনাশ চাই। তাদের ধ্বংস স্তূপের উপর যে শান্তিনিকেতনের সোপান সংগঠিত হবে তার প্রস্তুতির জন্যে অনতিকাল-বিলম্বেই প্রচেষ্টাকে করতে হবে কেন্দ্রীভূত, প্রবৃত্তিকে করতে হবে জাগরিত।

আর একটু বললে তাকে আর একটু বেশী করে বুঝতে পারবেন। তার মত সাধারণ মানুষের মত নয়, তার চিন্তা সাধারণ মানুষের চিন্তা নয়। তার কথাগুলো আমার মুখস্থের মত হ'য়ে গেছে, বলব শুনবেন ?

—বলুন না, অপূর্ব লাগচে—অভিভূতের ন্যায় শাশ্বতী বলে।

অমরনাথ বলিয়া যাইয়া থাকে, সে বলে কি জানেন, বলে, পরিবর্দ্ধন চাই না, পরিবর্তন চাই। পরিবর্জন চাইনা, বর্জন চাই। পরিশোধন চাই না, শোধন চাই। সংস্কারকে নমস্কার করি, নূতন প্রতিষ্ঠানকে প্রণাম করি। সংস্কারের ত্রুটির ফাঁকে যে কুসংস্কার উঁকি দেয় তাকে আতস্তর বলে মনে করি। দুঃখের উপশম চাই না, দুঃখের বিনাশ চাই। প্রশমিত দুঃখে কাতর হই, প্রচণ্ড দুঃখকেই আহ্বান করি; দুঃখ প্রচণ্ডতার শেষ স্তরে পৌছলে তার বিনাশের সম্ভাবনা থাকে, দুর্নিবার ঝড় ঝঞ্ঝায় বিনাশেরই নিশ্চয়তা থাকে। সহানুভূতির চেয়ে সহযোগিতাই আমি কামনা করি। মানুষকে সম্মানের চেয়ে শ্রদ্ধা করেই আমি পাই আনন্দ। অর্চনার পেছনে থাকে আয়োজনের সমারোহ, তাই সাধনাকেই করযোড়ে প্রণতি জানাই।

শাশ্বতী বলিয়াছিল, সত্যি আপনি মানুষকে দেখেন না, মানুষকে দর্শন করেন। আপনার সুঅভিজ্ঞ বন্ধুর জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো কি চমৎকার আপনার মনোক্যামেরায় ছবি তুলে নিয়ে আপনার উপন্যাসে তার প্রকাশ দিয়েছেন। এই না হ'লে সাহিত্যিক! সত্যি আপনি অনন্য!

এই চারমাসে আর একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। অনিমেষকে লইয়া শাশ্বতী

প্রায়ই গাড়ি করিয়া পত্রিকার কাজ কর্মে বাহির হয়। সেদিন বিশেষ একটা জরুরী কাজে ব হির হইতে যাইবে এমন সময় চাকর খবর দিল ছোট গাড়ির ড্রাইভারের অসুখ বলিয়া সে আসিবে না। আর একখানা গাড়ি ভুবনেশ্বর-বাবুকে অফিস হইতে আনিতে গিয়াছে। শাশ্বতীর পিতার এক ধনী ব্যবসাদার বন্ধুর কাছে একটি বড় বিজ্ঞাপন আনিতে যাওয়ার কথা। শাশ্বতী নিজেই গাড়ি চালাইতে মনস্থ করিল। অনিমেষ পিছনের আসনে গিয়া বসিল। শাশ্বতী গাড়ি চালাইতে থাকে, ছাত্রী জীবনেই শাশ্বতী গাড়ি চালাইতে শিখিয়াছিল।

যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে পৌছাইলে অনিমেষ গাড়িতেই বসিয়া রহিল। শাশ্বতী তাহার পিতার বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া বিজ্ঞাপনের অর্ডারটি লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অনিমেষ চালকের জায়গায় বসিয়া গভীর মনযোগ সহকারে গাড়ি চালাইবার রীতিনীতিগুলো দেখিতেছে। শাশ্বতী হাসি চাপিতে না পারিয়া বলিল, ঐ একটু দেখলেই এ বিদ্যা শিক্ষা করা যায় না, রীতিমত অভ্যাস করতে হয় মশাই। অনিমেষের চমক ভাঙিয়া গেল, কহিল, না—মানে এই একটু দেখছি। বলিয়া পিছনের আসনে বসিবার জন্য উঠিতে শাশ্বতী বলিল, আমার চালানোর জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে আমার পাশেই বসুন। অনিমেষ তাহাই করে, সরিয়া বসে অনিমেষ। শাশ্বতী গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়া কহিল, যাক্ সাকসেসফুল হওয়া গেল।

অনিমেষ বলিল, সাক্‌সেসফুল যে হবেন তা আমি আগে থেকেই জানতাম। এতবড় সোর্স, সাকসেসফুল হবেন না তো কি ফেলিওর হবেন? গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। শাশ্বতীর সুবাস মাখানো জর্জেট্ শাড়ীর ঝক্‌ঝকে আঁচলের একটি প্রান্ত হাওয়ায় অনিমেষের গায়ে মুখে বারবার লাগিতেছিল। অনিমেষের নাড়ির দ্রুত স্পন্দন হইতে থাকে। মনে পড়িয়া যায় অনিমেষের বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার কথা। সংসার প্রাঙ্গণে বসিয়া বসিয়া অনিমেষ অনেক ভাবিয়াছে, দুঃখও সে অনেক পাইয়াছে। অনুশোচনার বহ্নিশিখায় ঝলসিয়া গিয়াছে অনিমেষের জীবন। কিন্তু আজকের অনুশোচনার কোন মূল্য নাই, আজকের অনুশোচনা শুধু আক্ষেপ। পরিশুদ্ধির এতটুকু সম্ভাবনা নাই। অভ্যাস বড় পাজী জিনিষ, habit is the second nature. কুমার জীবনের অভ্যাস আজও রেশ টানিয়া আছে তাহার বিবাহিত জীবনে। মেয়েছেলের নেশা মদের নেশার মতই পাজী জিনিষ। নেশা যখন অভ্যাসে দাঁড়ায়, নেশা করিব না বলিলে তখন নেশা ছাড়ে না।

নর্মদার মত স্ত্রী পাইয়াও অনিমেষ মাঝে মাঝে অন্যাসক্ত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ ঐ নেশা ছাড়া আর কি? যাহারা অনিমেষকে ভাল করিয়া জানেনা তাহাদের মধ্যে অনেকে অনুমান করে নর্মদা অপ্সরী নয় বলিয়া অনিমেষের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারে না :—তাহা কি সত্য? কি করিয়া হইবে তাহা সত্য। নর্মদা সুন্দরী না হইলেও বেশ সুশ্রীই বলা যায় বৈকি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, টানা টানা ডাগর ডাগর চোখ দু'টি ভারি সুন্দর ওর। গড়ন পেটন ও চমৎকার। ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইলে আদর্শ বধূ হিসাবে প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে যথেষ্টই। ব্যবহারও বড় মিষ্টি মধুর। অনিমেষকে নর্মদা ভালবাসে। অনিমেষের সরল উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ওপর ওর করুণা হয়। নর্মদার এই রূপ ছাড়িয়া দিয়াও নর্মদাকে নিকৃষ্ট ধরিয়া লইয়াও যখন অনিমেষের চরিত্রালোচনায় বসিতে হয় তখন ডলি সেনের সঙ্গে অনিমেষের প্রেমালাপটা সত্যই আশ্চর্য লাগে কারণ মিস ডলি সেন নর্মদাপেক্ষা বহুগুণ নিকৃষ্ট রূপ ধারণ করে। মিস ডলি সেনকে আর শ্যামবর্ণা বলা চলে না তবে কৃষ্ণবর্ণ শব্দটির সঙ্গে হয়তো 'ঘোর' বিশেষণটা বাদ দেওয়া চলিতে পারে এই যা! আর মুখ চোখ! আঙুল শুদ্ধ হাতের তালুটা যদি এঁটেল মাটিতে একবার ডুবাইয়া লইয়া কাউর মুখে খুব জোরে একটা সামনাসামনিভাবে থাপ্পর মারা যায় তাহা হইলে তাহার মুখের যে চেহারা হইবে ঠিক সেই রকম মুখের গড়ন মিস ডলি সেনের! তবে স্বাস্থ্যটা নিটোল। এ হেন মিস ডলি সেনের সঙ্গে অনিমেষের যে কি করিয়া মাখামাখি হইয়াছিল সেইটাই মহাবিস্ময়ের ব্যাপার! এর কারণ নিরূপণ করিতে হইলে ফ্রয়েডের সাহায্য ছাড়া হইবে না। ফ্রয়েডের মতানুসারে মিস ডলি সেনের কাছ থেকে অনিমেষ কিছু কম সুখ পায় নাই। তবে একেবারে সুখই পাইত না যদি না অনিমেষ অঙ্কুরেই কুঅভ্যাসের ধাপগুলোয় পা দিত। দেহের ক্ষুধাকেই অনিমেষ গোড়াগোড়ি হইতে বড্ডবেশী প্রাধান্য দিয়াছে। সে-ক্ষুধার সময় অনিমেষের কাছে কোন রুচি অরুচির প্রশ্নও ওঠে না, কোন ভাল মন্দেরও প্রশ্ন খবরদারি করে না।

নর্মদাকে যখন নববধূ হিসাবে পাইয়াছিল তখনও অনিমেষ তাহার সহিত রোমান্স করিয়াছিল, তাহার সহিত প্রেম করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক বছর অতিক্রান্ত হইলে যখন 'নববধূ' হইতে 'নব' খসিয়া বধূই শাশ্বত হইয়া রহিল নর্মদার নামের পিছনে তখন অনিমেষের প্রেম নর্মদার কাছ থেকে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে ;- অনিমেষের ভালবাসাই তখন শুধু নর্মদাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অনিমেষের প্রেম

তখন কামনার কুহরে কুহরে আছাড় খাইয়া খাইয়া ফিরিয়াছে। নর্মদা যখন সংসারকে লইয়া ব্যস্ত, ছেলেকে লইয়া চিন্তিত তখন অনিমেষ অতৃপ্ত প্রেমের প্রলুব্ধ হাতছানিতে দিকভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া মরিয়াছে। এইভাবে মনে পড়িয়া যায় অনিমেষের বিগত দিনের কথা। ট্যাক্সি অথবা প্রাইভেট গাড়ির পিছনের আসনে কত মেয়ের পাশে বসিয়া প্রণয় দেওয়া নেওয়া করিতে করিতে গিয়াছে! মেয়েদের লইয়া অত্যধিক পরিমাণে রোমান্স করিয়া এমন বদ অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে অনিমেষের যে, রোমান্স করিবার সুযোগ আসিলে সুযোগ ছাড়িতে তাহার মন চায় না। সুযোগ! ইহাও তো একটি সুযোগ! শাশ্বতীর কথাও সে জানিয়া লইয়াছে, শাশ্বতী বলিয়াছে, তাহার স্বামী বিদেশে থাকেন—বনাবনি নেই। দেহ-মনের ক্ষুধা শাশ্বতীর অবরুদ্ধ। প্রত্যাখ্যান নিশ্চয়ই শাশ্বতী করিবে না। শিহরণ লাগে অনিমেষের। গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। অনিমেষ নিমেষের মধ্যে তাহার একটি উষ্ণ বাহু শাশ্বতীর দিকে বাড়াইয়া শাশ্বতীর বাম হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বুকের কাছে টানিয়া লইতেই শাশ্বতীর মুখখানি সঙ্গে সঙ্গে লাল হইয়া উঠিল, হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে শাশ্বতী কহিল, ছিঃ অনিমেষবাবু। এ দুর্বলতাটুকু ত্যাগ ক'রে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারেন না? এই জন্যই কি সেদিন আপনি নর আর নারীকে লোহা চুম্বকের সঙ্গে তুলনা ক'রেছিলেন? কিন্তু দেখলেন তো আপনার উপমাটা ভুল। বিধির বিধানে আমিই হলাম আপনার ভুল ভাঙানোর সংজ্ঞা। অনিমেষ লজ্জায় ঘৃণায় নিথর হইয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি তখন ময়দানের সুমুখ দিয়া যাইতেছে। শাশ্বতীই কহিল, চলুন একটু ভিক্টোরিয়ায় বসা যাক।

অনিমেষ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনিই আমার মস্তকে প্রথম আঘাত করলেন, শাশ্বতী দেবী। অনেক মেয়েই এসেছে আমার জীবনে। দোষ আমার আমি জানি, আমি জানি আমি চরিত্রবান নই কিন্তু তারাই তো আমায় চরিত্রহীন ক'রে তুলেছিল। কেউ তো আমায় বাধা দেয়নি আপনার মত সেদিন। যার দিকে হাত বাড়িয়েছি, তাকেই পেয়েছি ভোগের সামগ্রী হিসেবে। একজনও তো প্রত্যাখ্যান করেনি আপনার মত। তারা যদি সেদিন আমায় রুখত তাহলে হয়তো আমার জীবন আজ এতখানি কলুষ হ'ত না। কেন রয়েছে এতখানি তফাৎ আপনার আর তাদের মধ্যে শাশ্বতী দেবী। তারাও স্ত্রী-জাতি আপনিও তাই।

শাশ্বতী কহিল, কেন, খুকীর জন্মদিনে আপনি আপনার বন্ধুর যে বক্তৃতা-

লিপিটি পড়লেন তাতেই তো আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন অনিমেষবাবু। পরিবেশের অবদান প্রকৃতি। পরিবেশ থেকেই প্রচেষ্টার উদ্ভব।

—সত্যি আপনি আমার চোখ খুলে দিলেন শাশ্বতী দেবী, পুরোনো পাপের যেন আজ প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে গেল।

কথায় কথায় গাড়ি ময়দান পার হইয়া আসিল। ভিক্টোরিয়ায় আর বসা হইল না। গাড়ি লইয়া যথাসময় শাশ্বতী বাড়ী পৌছিল। অনিমেষ সেদিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

এই চার মাসে আরও একটি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। তাপসী নামে একজন সুন্দরী এবং সাহিত্যেষৈষা কুমারী যুবতী অমর-সাহিত্যে আকৃষ্ট হইয়া অমরনাথের কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই চার মাস ধরিয়া সে অমরনাথের শিষ্যা হিসাবে কাটাইয়া নিজেকে ধন্য করিয়াছে। দু'একটি পত্রিকায় অমরনাথের অনুরোধে তাহার লেখাও ছাপা হইয়াছে। তাপসীর শিষ্যত্বের তপস্যা প্রেমের তপস্যায় রূপান্তরিত হইবার উপক্রম হইলে অমরনাথ চিন্তিত হইয়া পড়িল। 'আপনি' সম্বোধন যথাসময় 'তুমি'তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমরনাথ ভাবে, তাহার নামে লিখিত সাহিত্যের উপরই তাপসীর অনুরাগ, অনুরাগটা তো অমরনাথের উপর নয়! এইভাবে সে দিনের পর দিন একটা মেয়েকে প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না। না কিছুতেই নয়। কিন্তু·· অমরনাথের অন্তরাত্মা বলিয়া ওঠে, সে যে তাপসীকে ভালবাসিয়াছে। যতবার সে তাপসীকে এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে ততবার সে বিফল হইয়াছে। তাপসীর করুণ আবেদনকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে নাই অমরনাথ একদিনের জন্যেও, তাপসীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইয়াছে, বুকের কাছে টানিয়া লইয়াছে, খরস্রোতা দুর্বলতা অব্যাহত গতিতে পাড় ভাঙ্গিয়া, কুল ছাপাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। অমরনাথ ভারাক্রান্তচিত্তে তাপসীর পাশে বসিয়া কতদিন কত কথাই না ভাবিয়াছে। ভাবিয়া কিছু সুফল হয় নাই—বরঞ্চ খারাপই হইয়াছে, অমরনাথের ভাবনা আরো জোট পাকাইয়া গিয়াছে।

তাপসীর ব্যক্তিগত আলাপ অমরনাথের ভালো লাগে, তাপসীর সাহিত্যালোচনা অমরনাথের মোটেই ভাল লাগে না। তাপসীর সাহিত্যালোচনার কেন্দ্র অমরনাথের সাহিত্য অতএব এ আলোচনা ভাল না লাগিবারই কথা, কারণ যা অমর-সাহিত্য বলে খ্যাত তাহাতে অমরনাথের কৃতিত্বের নাম গন্ধও নাই। অমর সাহিত্যের উৎস যে অমর নয়, অমিতাভ—এ কথা ফুলের মালা

অথবা প্রশংসার ঝুড়ি দিয়া অমরনাথের মনকে চাপা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। তাপসী সাহিত্যের প্রসঙ্গ আনিলেই অমরনাথ বলিত, তোমার ঐ এক আলোচনা। আচ্ছা, সাহিত্য তোমায় পেয়ে বসেছে। সাহিত্যই তোমার মাথা খাবে। উত্তরে তাপসী বলিত, তোমার মাথাটা তাহলে অনেকদিন আগেই সাহিত্যের খাওয়া হয়ে যেত। আচ্ছা, লেখা-জোখার কথা তুললেই তুমি এড়িয়ে যাও কেন বলত? আমি অপাত্র বলে নিশ্চয়? আমি কি এতই অপাত্র, মেজে-ঘষে কি একটু সুপাত্র করে নেওয়া যায় না আমায়?

—না-না তা নয়, অমরনাথ লজ্জিত হইত।

(৮)

সে দিন অপরাহ্নে বেশ টিপ টিপ করিরা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। অমরনাথ তাহার বাড়ীতে গিয়া একটা বই নাড়া চাড়া করিতেছিল। এমন সময় তাপসী আসিয়া হাজির হয়। অমরনাথের বৌদি নীরবালা আসিয়া খানিকটা তামাসা করিয়া চলিয়া যান। চাকরকে দিয়া চা পাঠাইয়া দেন তিনি। নীরবালা অমরনাথের মায়ের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন তাই অমরনাথের পিতা বিহার সরকারের চাকুরীর মেয়াদ আরো দুই বৎসরের জন্য বাড়াইয়া লইয়াছিলেন।

এ কথা সে কথার পর অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা তাপসী তুমি আমায় ভালবাস, না আমার সাহিত্যকে ভালবাস?

তাপসী একখানি বাহু অমরনাথের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিল, এ আবার কি অদ্ভুত প্রশ্ন? তোমার সাহিত্য থেকেই তো তুমি, তোমা থেকেই তো তোমার সাহিত্য। একটাকে পেলেই তো আর একটাকে পাওয়া যায়।

—পাওয়ার কথায় পরে আসচি, আগে বল কোন্‌টাকে ভালবাস?

—আচ্ছা বিপদে তো ফেললে। তোমার ব্যক্তিত্বকে ভালবাসলে তুমি খুসী হও, না তোমার সাহিত্যকে ভালবাসলে তুমি খুসী হও কোন্‌টা?

—আমি তোমার মতামত জানতে চেয়েচি, আমায় খুসী করার কথা তোমায় বলচি না।

—কি মুস্কিল অত চটচ কেন? বলচি বাবা বলচি। তোমার ব্যক্তিত্বকেই আমি ভালবাসি কেন না তোমার উন্নত মনের বিকাশ থেকে, তোমার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ থেকেই তোমার সাহিত্যের অভ্যুদয়। অতএব, তোমার সাহিত্যে যখন অনুরাগ জন্মেছে তখন তোমাতেও অনুরাগ জন্মানোটা কি কিছু বিচিত্র?

ডিপার্টমেন্টের সবাই উঠে পড়ে লেগেচে তার পেছুনে, মায় বড়বাবু পর্যন্ত। লোকটি দোষের ভেতর ঘাড় নুইয়ে অন্যায় সহ্য করতে পারে না, আমি সব লক্ষ্য করি। কাজকর্মও লোকটি করে সব নিখুঁত ক'রে। কিন্তু নূতন লোক পেয়ে রাখহরিবাবুটা বেচারাকে নস্তানাবুদ করে ছাড়চে। রাখহরিবাবুকে এবার না বললে হ'চ্ছেনা। তা তাকে দিয়ে তোর আবার কি দরকার হল ?

তাপসী উচ্ছ্বাসে ভাঙিয়া পড়িয়া কহিল, ভদ্রলোক কতবড় যে একজন প্রতিভাশালী তার খবর কেউ রাখে না বাবা! আজ আমি জানতে পারলাম অমরনাথের সমস্ত রচনা তাঁর।

—সে কি রে ?

—হ্যাঁ বাবা, উনি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চান বলে বন্ধুর নামে সমস্ত লেখা বার ক'রচ্চেন। এখবর এখুনও কেউ জানে না, আমিই প্রথম জানলাম। ভদ্রলোককে একবার দেখতে পাব না বাবা ?

—নিশ্চয়ই দেখতে পাবি মা, তাকে এখানে ডেকে পাঠাচ্চি।

—না বাবা, চল আমরাই না হয় ওনার সিটের কাছে যাই, আমার একবার দেখতে ইচ্ছে ক'রচে, এত বড় একজন প্রতিভাবান লেখককে সামান্য কেরাণীর বেশে।

তাই চল্—বলিয়া অপূর্ববাবু কন্যাকে লইয়া রাখহরিবাবুর ডিপার্টমেন্টে গিয়া রাখহরিবাবুর ঘরে উপস্থিত হইলেন।

রাখহরিবাবু স্বয়ং মালিককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, চেয়ার হইতে উঠিয়া তাঁহাদের বসিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন। অপূর্ববাবু জিজ্ঞাসা করেন, অমিতাভবাবু কোথায় বসেন ?

রাখহরিবাবু একান্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, আজ্ঞে ডাকতে পাঠাব, অমিতাভকে ?

অমিতাভকে 'অমিতাভবাবু' না বলার জন্য রাখহরিবাবুর উপর তাপসী চটিয়া উঠিল, বলিল, অমিতাভ নয় 'অমিতাভবাবু'।

রাখহরিবাবুর যেমন অপ্রস্তুতের সীমা পরিসীমা রহিল না তেমনি ভয়েও প্রাণের ভিতরটা ধুক ধুক করিতে লাগিল। মেয়েটির এই স্নেষে তিনি বুঝিলেন অমিতাভকে 'অমিতাভবাবু' না বলিয়া তিনি নিশ্চয়ই ভীষণ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন। উপর্যুপরি তাঁহার মুখ থেকে যে কতবার 'আজ্ঞে' শব্দটি বাহির হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

অপূর্ববাবু গম্ভীর হইয়া পুনরায় কহিলেন, কোনখানে তিনি বসেন, বলুন। আমরাই যাচ্ছি। রাখহরিবাবুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না এবং অন্যান্য কর্মচারিবৃন্দ কাজের ভাণ করিয়া খাতায় মুখ গুঁজিয়া রহিল। কিন্তু কান খাড়া করিয়া অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অবশিষ্ট দৃশ্যের আশায় অধীর হইয়া উঠিল। রাখহরিবাবু তাঁহাদের লইয়া উপস্থিত হইলেন অমিতাভের জায়গায়। অমিতাভ তখন গভীর মনোযোগ সহকারে লেজার এনট্রি করিতেছিল। রাখহরিবাবু অমিতাভকে নির্দেশ করতেই তাপসী শশব্যস্তে অমিতাভের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, অমিতাভবাবু নমস্কার! সহসা নারী কণ্ঠে তাহার নাম উচ্চারণ শুনিয়া ফিরিয়া তাকাইল অমিতাভ। অপূর্ববাবুকে দেখিয়া সে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময় লাগে অমিতাভের। তাপসী পুনরায় বলিল, নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে এমন কি আপত্তি হ'ল, অমিতাভবাবু? অমর সাহিত্যের স্রষ্টা অমর নয়, অমিতাভ একথা যে আর চাপা থাকল না।

অপূর্ববাবু পাইপ হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, অমিতাভবাবু আপনি আমায় এভাবে অপরাধী করলেন কেন? আপনার মত 'জিনিয়াস'এর দাম আমি দিয়ে এসেছি মাত্র একশো দশটাকা, ছিঃ।

এই হ'চ্ছে আমার মেয়ে তাপসী। তাপসীর মুখ থেকে কথাটা শোনার পর থেকে আমি আমার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি, আপনাকে স্পেশাল অফিসার হিসেবে নতুন ক'রে এপয়েন্টমেন্ট দেব।

অমিতাভ স্তব্ধ হইয়া যায়—কোথা থেকে কি হইয়া গেল! তবে কি অমরনাথ সব প্রকাশ করিয়া দিয়াছে? অমিতাভ বিনীত হইয়া বলে, আজ্ঞে আপনারা কি যে বলেন, আমায় শুধু শুধু লজ্জা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। আপনারা নিশ্চয়ই অমরনাথের কাছ থেকে জেনেছেন। অমরনাথ এটা কেন করল?

তাপসী ম্লান হাসিয়া কহিল, তিনি আর পারলেন না চেপে রাখতে।

অপূর্ববাবু সহাস্যে কহিলেন, এখন চলুন আমার চেম্বারে। বলিয়া একপাশে অমিতাভকে ও অপর পাশে তাপসীকে লইয়া চলিলেন নিজের চেম্বারের দিকে।

রাখহরিবাবু এবং তাঁহার নিম্নস্থ কর্মচারীবৃন্দ বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া চায়ি করিতে লাগিলেন।

সেইদিনই অফিস হইতে বাহির হইয়া অমিতাভ অমরনাথের সহিত দেখা করিতে যায় কিন্তু অমরনাথকে বাড়ীতে না পাইয়া অমরনাথের বৌদিকে

বলিয়া আসিল অমরনাথ ফিরিলেই যেন একবার তাহার সহিত দেখা করে। বাড়ীতে অপেক্ষা করে অমিতাভ অমরনাথের জন্য কিন্তু অমরনাথ আর আসে না।

তাপসীর সহিত যে অমরনাথের প্রণয় ঘটিয়াছে তাহা অমরনাথ অমিতাভকে বলিয়াছে। আর কিছু চিন্তা না করিয়া অমরনাথ বিছানাপত্তর লইয়া বাহির হইল—উদ্দেশ্য ঘাটশিলা। সেদিন ছিল শনিবার। রবিবার সারাদিন কাটাইয়া রাত্রে ফিরিয়া চাকুরী, অমরনাথ, তাপসী, লেখক হিসাবে তাহার নাম প্রকাশ ইত্যাদি সম্পর্কে ঠিক করা যাইবে—অমিতাভ মনে মনে চিন্তা করিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

এদিকে শাশ্বতী তাহার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যার জন্য রবিবার সকালে অমরনাথের বাড়ী গিয়া হাজির হয়। শাশ্বতী মোটর হইতে নামিতেই দ্বারবান সেলাম দিয়া তাহাকে ড্রইং রুমে লইয়া গেল। তখন সকাল ৮টা। অমরনাথ সবে ঘুম হইতে উঠিয়াছে। চাকরের মুখে একজন মহিলা আসিয়াছে শুনিয়া তাহার মনটা বেশ খানিকটা চঞ্চল হইয়া ওঠে, তাহার বুকের যে স্থানটা হতাশায় আঁধার হইয়া গিয়াছিল সেই স্থানটিকে সহসা আশার ক্ষীণ আলো যেন স্পর্শ করে। অমরনাথ ভাবিল, বোধ হয় তাপসী তাহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। অমরনাথ ব্যস্ত হইয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিয়া দেখে তাপসী নয় শাশ্বতী। অমরনাথের অন্তর জ্বলিয়া গেল, ক্রোধে সে অস্থির হইয়া উঠিল—আবার সেই লেখা! আবার সেই সাহিত্য! না-না-না কিছুতেই সে তাহার সত্তার বিনষ্টি ঘটিতে দিবে না। অমরনাথ যে সে অমরনাথই, অমিতাভ যে সে অমিতাভই। সে কথনই সাহিত্যিক নয়। না-না-না, এ মিথ্যা। অমরনাথ উত্তেজিত হইয়া কহিল, আমি লেখক নই, আমি লেখক নই—মাপ করবেন আমায়। আমার নামে যে সমস্ত লেখা এতদিন বেরিয়েছে তার একটিও আমার নয়।

শাশ্বতী যেন আকাশ হইতে পড়িল, সবিস্ময়ে কহিল, কি বলচেন অমরনাথ-বাবু? ওঃ বুঝেছি, লেখা-লেখা ক'রে লোকে বড্ড তাগাদা দিচ্চে নিশ্চয়ই। তা এড়াবার মন্দ পন্থা আবিষ্কার করেন নি তো!

—সাত সকালে আপনার সঙ্গে রসিকতা করবার মোটেই আমার সময় নেই, যা বলছি তাই সত্যি! আমার নামে যে সমস্ত লেখা বেরিয়েচে সবই আমার বন্ধু অমিতাভ লিখেচেন! বন্ধুর অনুরোধে আমি সাহিত্যের আভরণ গায়ে দিয়ে থাকতুম। এ আভরণের ভার আমি আর সইতে পাচ্চি না, হয়তো এর

জন্তে আমাকে অপ্রিয় হতে হবে বন্ধুর কাছে। হলে কি ক'রবো, আমি নাচার। আপনি জানেন আমি একজন অঙ্কের অধ্যাপক, এবং এ পরিচয় ছাড়া আমার আর কোন পরিচয় নেই, দয়া ক'রে জেনে রাখতে প'রেন। আজ আমি এখুনি সমস্ত কাগজের অফিসে আমার একটা ষ্টেটমেণ্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে আর কাউকে আসতে হবে না। আমি একেবারে ফেড্ আপ্।

শাশ্বতী বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যায়—অমর-সাহিত্য অমরনাথের নয়, অমিতাভের; তার অবহেলিত স্বামীর? শাশ্বতী মিনতি করিয়া কহিল, দয়া ক'রে লেখকের ঠিকানাটা দেবেন? অমরনাথ ক্ষিপ্র হস্তে অমিতাভের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া একটি ছোট্ট নমস্কার করিয়া চঞ্চল পদে উপরে উঠিয়া গেল। শাশ্বতী একরূপ টলিতে টলিতে সেই বাড়ী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিজের গাড়িতে উঠিয়া গাড়িতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ি চলিল অমিতাভের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। অনুশোচনার সুতীব্র দহনে তাহার হৃদপিণ্ড যেন পোড়া কাঠের রূপ লইল, বেদনায় টন্‌টন করিয়া উঠিল তাহার হৃদয়। একদিন যে স্বামীকে অনুগ্রহ করিতেও সে দ্বিধাবোধ করিয়াছে তাহারই অনুকম্পার জন্য আজ এখুনি তাহাকে ছুটিতে হইবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যাচ্ঞা করিতে হইবে—নিশ্চয়ই করিবে, এ যাচ্ঞায় লজ্জা নাই, আছে আনন্দ। মূর্খ বলিয়া যাহাকে সে পথে ফেলিয়া গিয়াছে, সেই আজ অসামান্য পণ্ডিত হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছে। তাহার কাছে হাঁটু গাড়িয়া করুণা ভিক্ষা করিলে আনন্দ পাওয়া যাইবে, সে যে তাহার স্বামী! এ পরাজয়ে লজ্জা নাই, এ পরাজয়ে গর্ব আছে।

যথাসময় গাড়ি আসিয়া অমিতাভের বাড়ী পৌঁছিল। গাড়ি হইতে দ্রুতপদে নামিয়া শাশ্বতী সোজা বাড়ীর ভিতর গিয়া ঢুকিল। রামচরণ এইভাবে বিনা জিজ্ঞাসাবাদে একজন মহিলাকে বাড়ীর ভিতর আসিতে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। শাশ্বতী কহিল, বাবু কোথায়—অর্থাৎ অমিতাভবাবু? তুমি কে, তোমার নাম কি?

রামচরণ সবিনয়ে জানাইল, বাবু তো আমার একটাই—অমিতাভবাবু। তা উনি তো গেছেন বাইরে। বলে গেচেন আজ রাত্রেই ফিরে আসবেন। আমি বাবুর সেবাদাস, আমার নাম রামচরণ।

—আহা বাবু না হয় বাইরে গেছেন, আমি তো আর যাই নি।

এ কথায় রামচরণের বিস্ময় বাড়িয়া যায় 'আমতা' 'আজ্ঞে' কথাগুলো পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইল তাহার মুখ হইতে। রামচরণ হঠাৎ যেন বুঝিয়া

ফেলিল, গদগদ হইয়া বলিল, মা আপনি আমাদের লক্ষ্মী। এতদিন পরে কেন মা? এমন দেবতা ফেলে কেমন ক'রেছিলেন মা এতদিন।

শাশ্বতীর বুকের ভিতর যে কান্না জমা ছিল।তাহা ফাটিয়া পড়িতে চাহিল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শাশ্বতী কহিল, তোমরা আমায় এতদিন নিয়ে আসনি কেন, রামচরণ?

রামচরণেরও চোখে জল আসিয়া পড়ে, জলভরা চোখে রামচরণ কহিল, আমি কি ছাই জানি বাবুর লক্ষ্মী থেকেও নেই, বাবুর সব কথাবার্তা কেমন যেন হেঁয়ালি হেঁয়ালি। আমি জানি আমার বাবু চিরকালই এমনই একলা। কথা তো বাবু কাউর সঙ্গেই বেশী বলেন না, তা আমার সঙ্গে তো কোন ছার। বাবু নিজেও কাউর সঙ্গে তাঁর নিজের বাড়ী ঘর পরিবারের সম্বন্ধে কথা বলেন না, কেউ বাবুকে এ সব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ও করে না, যারা আসে তাদেরকেও কখনও তাদের ঘর সংসার সম্বন্ধে কথা বলতে দেখিনে বাপু। আমি ছাই, জানবো টা কি ক'রে। অমরবাবু প্রায়ই আসেন তা তাঁর সঙ্গেও তো কখনও দেখিনি বাবুকে সংসার ধর্মের কোন কথাবার্তা বলতে। কি সব বড় বড় ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হয়, তার এক বর্ণও আমি বুঝি না। আমি ভয় কাটিয়ে একদিন বলেছিলাম, বাবু ঘরে লক্ষ্মী আনুন না একটি। উত্তরে বাবু বলেছিলেন, এখান থেকে কুমোরপাড়া কিম্বা পটোপাড়া অনেক দূর রামচরণ, আমার তো সময় হবে না, তুই পারিস তো একটা কিনে আনিস না। আমি মাথা চাপড়ে বাবুকে বললেম, প্রিতিমা লক্ষ্মীর কথা বলছিনে বাবু, আমি বলছি বউ নিয়ে আসতে ঘরে একটি। উত্তরে বাবু হেসে বললেন, বউ তো একটার বেশী দু'টো আনা যায় না, রামচরণ। আমি আশ্চয্যি হ'য়ে বললেম, সে কি গো, দু'টো বউ আমি নিয়ে আসতে বলচি নাকি? আমি তো একটা বউই আনতে বলচি। বাবু আবার হেসে বললেন, একটা বউ তো অনেকদিন ক'রেচি রামচরণ তিনি যদি না আসেন তাহলে আমি কি ক'রতে পারি, বল্?

আর কিছু না বলে বাবু অফিসে বেরিয়ে গেলেন। তারপর বাবু ফিরে এলে সময় সুযোগ মত কথাটা আমি আবার পাড়তে গিয়েছিলেম কিন্তু বাবু এমন উপহাস ক'রে কথাটা উড়িয়ে দিলেন যে আমি আর কিছু বলতেই পারলেম না।

শাশ্বতী নির্লিপ্তের মত কহিল, কি বলল তোমার বাবু, রামচরণ।

রামচরণ মুখটাকে বিকৃত করিয়া বলিল, সে যা বললেন, একেবারে অবস্তর। বললেন কি—আরে দূর তুই যেমন হ'য়েচিস, রামচরণ, আমার কথাটা বিশ্বাস করলি, তোর ঘটে একটুও যদি বুদ্ধি থাকত। আমার মত লোকের হাতে কি কেউ মেয়ে দিতে চায়, না কোন মেয়ে আমায় বিয়ে ক'রতে রাজী হয়! বলিয়া ঘরে খিল দিয়া লেখাপড়া করতে বসলেন।

শাশ্বতী অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে কহিল, তোমার বাবুকে আজ ও কেউ চিনতে পারেনি, রামচরণ। আমিও চিনতাম না। তাঁকে জেনে, তাঁকে চিনেই তো তাঁর করুণার জন্যে ছুটে এসেচি, বাবা।

রামচরণ অনেকবার অনেক রকম করিয়া শাশ্বতীর জন্য রান্না করিতে চাহিতে শাশ্বতী বলিল, তোমার বাবুর প্রসাদ না পেয়ে আর আমি জল গ্রহণ ক'রব না, রামচরণ। তুমি বরঞ্চ বিকেলেই বাজার হাট ক'রে নিয়ে এস, আমি রান্না বান্না ক'রব।

শাশ্বতী সমস্ত ঘর দোর ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, ক্রমে সকাল এবং দুপুর গড়াইয়া গেল! অন্তরের চাপা বেদনা লইয়া শাশ্বতী ব্যাকুল প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত গুণিতে থাকে।

অপরাহ্নে শাশ্বতী জানালায় বসিয়া বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। রামচরণ বাজারে গিয়াছে। একটি কুমারী মেয়েকে মোটর হইতে নামিয়া সেই গৃহেরই দ্বারে করাঘাত করিতে দেখিয়া শাশ্বতী দ্বার অর্গলমুক্ত করিল। মেয়েটি রূপসী এবং আধুনিকা। শাশ্বতী কৌতূহলী হইয়া পড়ে। মেয়েটির ভাবভঙ্গি অত্যন্ত ব্যস্ত সমস্ত। শশব্যস্তে সে প্রশ্ন করে—আচ্ছা এইটাই তো অমিতাভ মিত্রের বাড়ী, না? আমার যেন কি রকম ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, আমি এসেছিলুম একদিন এই বাড়ীতে।

হাঁা, হাঁা, ঠিকই আছে। আপনি ভুল করেন নি। শাশ্বতী উত্তর দেয়।

—আচ্ছা, তিনি কি বাড়ীতে আছেন? আবার প্রশ্ন।

—না, তিনি বাইরে গেছেন, আজ রাত্রেই ফিরবেন—যথাবিহিত নিয়মে উত্তর দেয় শাশ্বতী।

খানিকটা অপেক্ষা করা যাবে কি—যদি একটু তাড়াতাড়ি ফেরেন? আবেদন আসে।

—নিশ্চয়ই যাবে। আসুন ভেতরে বসুন। শাশ্বতী সৌজন্য প্রদর্শন করে।

অমিতাভের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া প্রথমে তরুণীটি ঘরের আসবাব এবং দেওয়ালের ছবিগুলির দিকে লক্ষ্য করে। ছবিগুলি পৃথিবীর খ্যাতিমান্

সাহিত্যিকবৃন্দের। এই সমস্ত ছবিগুলি শাশ্বতীর কাছে নূতন নয়—কারণ এইগুলিই বিহারে অমিতাভের কোয়ার্টারে টাঙানো ছিল। কিন্তু ছবিগুলি আগন্তুক তরুণীটির কাছে নূতন। অবাক বিস্ময়ে তরুণীটি চাহিয়া থাকে ছবিগুলির দিকে। বিহ্বল হইয়া সে বলিল, বাস্তবিক অমিতাভবাবুর টেষ্ট আছে। কি চমৎকার বাছাই বাছাই ছবি! ঘরটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া পুনরায় কহিল, অমিতাভবাবুর রুচি শিল্পী মনের পরিচয় বহন করে। তন্ময়ভাব কাটিলে মেয়েটির কৌতূহল হয় তাহার সম্বন্ধে যে তাহার সুমুখে বসিয়া আছে, যাহার সিঁথির সিন্দুর প্রমাণ করিতেছে সে বিবাহিতা! মেয়েটির বুকটা ছ্যাৎ করিয়া ওঠে বৈকি! অমিতাভবাবু কি বিবাহিত? মনের কোণ হইতে জিজ্ঞাসা ঠেলিয়া বাহির হয়। সে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করে—

—কিছু মনে করবেন না, আপনি অমিতাভবাবুর কে হন?

—না না এতে মনে করার কি আছে ভাই। আমি ওঁর এক আত্মীয়া হই। বিহারে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, তাই ভাবলাম একবার দেখা ক'রে যাই। বর্তমানে আমিও যদিও কলকাতায় থাকি তবে আসা ঠিক হয়ে ওঠে না ভাই। আসব কি, পাত্তা কি পাওয়া যায় ওনার। একলা লোক ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই। বউ ছেলের সংসার নেই। খুশীমত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান। নিজের পরিচয় গোপন করিয়া যায় শাশ্বতী।

তরুণীটি আশ্বস্ত হয়। কথাটার একবর্ণ মিথ্যা হইতে পারে এ ধারণা না হওয়ারই কথা। কারণ বাহিরে সে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে আর একখানি গাড়ি।

শাশ্বতী পাল্টা প্রশ্ন করে—আপনি কে ভাই?

—আমি? ওঁর লেখার একজন ভক্ত বলে মনে ক'রে নিতে পারেন আমায়। আমার নাম তাপসী। আমি মহা বিপদগ্রস্ত। আপনি নিশ্চয়ই জানেন অমরনাথ মুখোপাধ্যায়ের নামেই উনি লিখে আসচেন।

—অমরনাথ বাবুর কাছ থেকেই জেনেছি। ওঁর কাছ থেকে এখুনও কিছু জানতে পারিনি।

—অমিতাভ বাবুর লেখা আমায় আকৃষ্ট করলে আমি অমরনাথ বাবুর সঙ্গে আলাপ করি। সকলের মত আমিও জানতাম অমরনাথ বাবুরই লেখা। অমরনাথ বাবুর কাছে সাহিত্য শিক্ষার জন্যে নিত্য নৈমিত্তিক যেতে থাকি। কিন্তু তিনি গোড়াগোড়ি থেকে সাহিত্য আলোচনাটাকে

এড়িয়ে যেতেন। সেই দেখে আমি অনেক সময় হতাশ হ'য়ে পড়তাম, ভাবতাম আমি অযোগ্য তাই বোধ হয় অমরবাবু আমার সঙ্গে সাহিত্যালোচনায় প্রবৃত্ত হন না। অমরবাবু ব্যক্তিগত আলাপটাই বেশী পছন্দ করতেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমার কিন্তু ক্রমেই বেড়ে যায়। সাহিত্যকে আমি ছোটবেলা থেকেই ভালবাসি। মনে মনে সংকল্পও ক'রেছিলাম, বিয়ে যদি ক'রতে হয় তো বড় কোন সাহিত্যিককেই বিয়ে ক'রব। কোন বড় সাহিত্যিক পাত্রের কাছে পাত্রী হিসেবেও আমি খুব খারাপ নই। তবে খুব বড় সাহিত্যিক না জুটলেও মোট কথা একজন সাহিত্যিককেই বিয়ে ক'রব। আমার বাবা মায়েরও ইচ্ছে, আমার বিয়ে হোক বড় একজন কাউর সঙ্গে যার অর্থ তত না থাকলেও খ্যাতি আছে এমন কাউর সঙ্গে, বলতে কইতে ভাল এই কারণে তাঁদের এই ইচ্ছে। ভাগ্যবলে ঘনিষ্ঠতা হ'ল অমরনাথ বাবুর সঙ্গে। উনি আমাদের বাড়ীও কয়েকবার গিয়েচেন। আমার বাবা মায়ের খুবই পছন্দ হ'ল ওঁকে। এত বড় একজন লোকের সঙ্গে তাঁদের মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তাঁরা গর্বিতই হবেন। জাত বিচারের সংস্কারভরা প্রশ্ন দুই তরফের কোন তরফ থেকেই ওঠেনি কিন্তু অমরনাথ বাবু যেদিন বললেন—অমর-সাহিত্যের রচয়িতা অমিতাভ মিত্র সেদিন ঘটনার সমস্ত চাকা গেল ঘুরে। আমার হৃদয়ে অমরের পরিবর্তে অমিতাভ আসন ক'রে নিল। আমি ছুটলাম আসল প্রতিভার কাছে। জানতে পারলাম উনি আমাদের অফিসেরই একশো দশ টাকা মাইনের একজন কেরাণী। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন আমার বাবা। নিয়ে গেলেন আমায় অমিতাভ বাবুর কাছে। পরিচয় হ'ল। প্রত্যক্ষ করলাম দীপ্ত প্রতিভাকে। অস্বীকার করতে পারলেন না অমিতাভ বাবু নিজের পরিচয়। অহেতুক লজ্জিত হ'লেন—যেন প্রতিভাটা তাঁর অপরাধ। অদ্ভুত মানুষ! অমর-সাহিত্যের রচয়িতাকে চিনে নিতে বিলম্ব হ'ল না কিছুক্ষণ আলাপের পর। বাবা 'অফার' করলেন অমিতাভ বাবুকে অফিসারের চাকরী। বাবার সেই চাকরী বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান ক'রে স্মিত হেসে বললেন অমিতাভ বাবু, তা হয় না স্যার! আমায় একা অফিসারের মাইনে দিলে তো হবে না অপূর্ব বাবু, আমার সমস্ত সহ-কর্মীকেই দিতে হবে ঐ মাইনে। বাবা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ দুইই হ'লেন, বললেন, যারা বরাবর আপনার পেছুনে লেগে আসচে তাদের জন্যে আপনি আমায় এই অনুরোধ ক'রচেন অমিতাভ বাবু! আশ্চর্য লোক আপনি! আর

তাছাড়া তা কি করে সম্ভব হয়, আপনার কৃতিত্ব আছে তাই দেব আপনাকে প্রোমশন। তাদের তো আপনার মত কৃতিত্ব নেই—তাদের প্রশ্ন তো ওঠে না। আপনার এ আদর্শ বাস্তব পন্থী নয় অমিতাভ বাবু, বড্ড কল্পনা বিলাসী। এই কথায় অমিতাভ বাবু ছোট্ট একটা উত্তর দিলেন, সেই জন্যেই তো আমি উন্নতি চাইচি না, অপূর্ব বাবু। যতদিন ভাল লাগে ততদিন আপনার কেরাণীর চাকরীই আমায় ক'রতে দিন, স্যার। অপূর্ব লোক সত্যি উনি! অনেক সাহিত্যিক আছেন—তাঁরা যেটাকে খারাপ বলে লেখেন সেটাই তাঁরা আগে করে বসেন, ভাল যেটাকে বলেন বাস্তব ক্ষেত্রে করবার বেলায় তার ধার দিয়েও ঘেঁষেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের 'মাটি টাকা টাকা মাটি'র ওপর যে লেখক পূরো একটা অধ্যায় লেখেন তিনিই কথায় কথায় টাকার জন্যে লোকের কাছে হাত বাড়ান। জনসভায় দাঁড়িয়ে যে বক্তা মজদুর মেহতী জনতার ওপর সহানুভূতি ক'রে গরম গরম বক্তৃতা দেন তিনিই সব চেয়ে কম মাইনে দেন তাঁর বাড়ীর চাকরকে, সবচেয়ে বেশী গাল দেন তিনি তাঁর বাড়ীর ঝিকে। শুধু ব্যতিক্রম দেখলাম অমিতাভ বাবুর বেলায়। আশ্চর্য! ওঁকে পাওয়ার জন্যেই আমার অন্তর এতকাল তপস্যা ক'রে এসেচে, ঘটনাচক্রে আমার নামটাও হ'য়েচে তাপসী। ওঁকে পেলেই আমার নামটা সার্থক হবে ভাই।

একজন ভাবের বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে বলিয়া চলিয়াছে, একজন নিশ্চুপ নীরব, অচঞ্চল তরুলতার ন্যায় বিহ্বল হইয়া শুনিতেছে। বক্তা এবং শ্রোত্রী দু'জনের চক্ষুই অশ্রুভারে সজল হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় বাহিরে চেঁচামেচি শুনিয়া তাহাদের দু'জনেরই চমক ভাঙিল। দু'জনে জানলার কাছে আসিয়া দেখিল, অগণিত লোক সেই বাড়ীর সুমুখে সচীৎকারে উল্লসিত হইতেছে এই বলিয়া—জয় অমিতাভ মিত্রের জয়। অমর-সাহিত্যের অমর সাহিত্যিক অমিতাভ মিত্রের জয়। শাশ্বতী দরজা খুলিয়া সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া বলিল, উনি ঘাটশিলায় গেছেন, আপনারা দয়া ক'রে কাল সকালে এসে ওঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যাবেন। এর মধ্যে আপনারা কি ক'রে খবর পেলেন?

যাঁহাকে সেই জনতার নেতা বলিয়া মনে হয় তিনি বলিলেন, এ বেলার সমস্ত কাগজে বেরিয়ে গেছে। কাল সকালে আরো বড় ক'রে বেরোবে খবরটা। তাহারা সকলে অমিতাভের জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাকী রইল শুধু তাপসী।

ইতিমধ্যে রামচরণ বাজার হাট করিয়া খিড়কির দরজা দিয়া ঢুকিয়া

পড়িয়াছে। ভাঁড়ার ঘরে জিনিষ পত্তর রাখিয়া রামচরণ শাশ্বতী এবং তাপসী যেখানে বসিয়াছিল সেইখানে আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, মা, যা যা জিনিষ বলেছ সব এনেচি। দেখবে, মা, বাবু এসে তোমাকে দেখে কি অবাকই না হন। কতদিন পরে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসেচে, এ কি কম কথা! তোমাদের যে কি ব্যাপার তা বুঝি না! স্বামী স্ত্রী বলে কথা—এতদিন কখনও মান অভিমান করা চলে! আমাতে আর আমার গিন্নীতে তো হয়-না কথায়ই ঝগড়া হয়—কৈ আমি তাকে ছাড়তে পারি, না সে আমায় ছাড়তে পারে! তা এঁকে তো চিনতে পারলেম না। ওঃ! বুঝেচি বাবুর লেখার সমঝদার। পাড়ার কত লোকই আমায় ডেকে ডেকে বলল, আরে রামচরণ, তোর বাবু একজন মস্ত বড় লেখক, আজ সব কাগজে ছাপা হ'য়ে গেচে। তোর খুব ভাগ্য ভাল এত বড় একটা লোকের বাড়ীতে চাকরী পেয়েচিস। শেষের কথা কয়টি আপন মনে বলিতে বলিতে রামচরণ ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ইহার ভিতরই রামচরণ শাশ্বতীকে 'তুমি' সম্বোধন করিয়া বাৎসল্যের সম্পর্কটা পাকাপাকি করিয়া লইয়াছে।

রামচরণের কথায় তাপসী স্তব্ধ হইয়া যায়, শাশ্বতীর মুখ রাঙা হইয়া ওঠে লজ্জায়। তাপসী ম্লান মুখে কহিল, ক্ষমা করবেন আমার ধৃষ্টতাকে। তবে অমিতাভবাবু বিবাহিত জানলে তাঁর সম্বন্ধে লোভটা চাপা দিয়েই রাখতুম। লোলুপতা প্রকাশে আপনিই আমায় বাধ্য করলেন, তার জন্যে আমার কোন দোষ নেই কিন্তু। বলিয়া একটি নমস্কার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। গমনোদ্যত তাপসীকে শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোথায় যাবেন এখন? তাপসী মুখ ফিরাইয়া সহাস্যে বলিয়াছিল, অমর-সাহিত্য থেকে সাহিত্যটাকে মাইনাস ক'রলে যা থাকে তার কাছেই ফিরে যাচ্ছি ভাই। রামচরণের কাছ থেকে শুনে আমারও যেন মন থেকে একটা পাষাণ নেমে গেল।

ব্যক্তি অমরকে ত্যাগ ক'রে অমর-সাহিত্যের পেছনে ছুটে অমর-সাহিত্যের রচয়িতাকে যখন আবিষ্কার করলুম তখন মনের ওপর নির্বাচনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তার আসল গতিবিধিটাকে অবরোধ ক'রেচি, তখন মন কি বলচে, মন কি চাইচে, সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ করিনি, মন কি পাবে সেই নিয়েই হিসেব ক'রতে বসেছিলুম। অবচেতন মনেরও যে একটা চাহিদা আছে তা টের পাইনি সেদিন। ব্যক্তি অমরনাথের দিকেই যে মনটা মগে তারি সেকথা এখন যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করচি তখন ঠিক সেই ভাবে করিনি। তখন যদি বুঝতুম

তাহলে অমরনাথ যেদিন জানতে চেয়েছিল ব্যক্তি অমরনাথকে ভালবাসি, না, সাহিত্যিক অমরনাথকে ভালবাসি সেইদিনই মনের ওপর যে সমারোহ প্রভাববিস্তার ক'রে আছে তাকে সরিয়ে দিয়ে বলতুম—ব্যক্তি অমরনাথকেই আমি ভালবাসি।

শাশ্বতী নিথর নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকে। রামচরণ আসিয়া কহিল, মা চুপটি ক'রে বসে বসে কি ভাবচ, সময় যে বয়ে যাচ্চে। রান্না ক'রবে বলেছিলে, চল।

শাশ্বতী উঠিয়া পড়ে, শান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, চল, রামচরণ।

শাশ্বতীর রান্না-বান্না সারিতে ন'টা বাজিল। গা ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া শাশ্বতী অমিতাভের আসার পথপানে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ঘড়ির কাঁটা ১০টা হইতে ১১টায় পৌছে তবু অমিতাভের দেখা নাই। ১২টা বাজিতে যখন কিঞ্চিৎ বাকী তখন একখানি ট্যাক্সি আসিয়া গৃহের সুমুখে দাঁড়াইতেই শাশ্বতী ব্যস্ত হইয়া বাহিরের আলো জ্বালিয়া জানালা দিয়া যাহা দেখিল তাহা মর্মান্তিক—অমিতাভকে ধরাধরি করিয়া জনতিনেক লোক নামাইতেছে। শাশ্বতী চঞ্চল পদক্ষেপে দরজা খুলিয়া দিতে তাহারা অমিতাভকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বিছানায় অমিতাভকে শোয়াইয়া তাহারা বলিল, ট্রাম থেকে পড়ে ডান হাতে সামান্য চোট লেগেচে, আমরা বড় ডাক্তারখানায় ডাক্তার দেখিয়ে হাতে প্লাষ্টার করিয়ে এনেছি। একটু সাবধানে রাখবেন। হাত যেন বেশী নাড়াচাড়া না করেন।

রামচরণ গলা ছাড়িয়া কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অমিতাভ শান্ত-কণ্ঠে কহিল, কাঁদচিস কেন রামচরণ। তোর বাবু তো মরেনি রে, সামান্য একটু চোট লেগেচে ডান হাতটায়। যে পথিকরা তাহাকে বাড়ী রাখিতে আসিয়াছে তাহাদের উদ্দেশ করিয়া অমিতাভ কহিল, মামুলি ধন্যবাদ দিয়ে আর আপনাদের ছোট ক'রব না ভাই। আপনারা না থাকলে আরো কতক্ষণ যে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে থাকতুম তা কে জানে!

তাহাদের মধ্যে একজন বলিল, এ আর এমন কি, অমিতাভবাবু। মানুষের উপকার মানুষেরই করা উচিত একথা আপনার রচনাবলীতে আপনিই তো নানাভাবে বলেচেন। ডাক্তারখানায় আপনি আপনার নাম বলতেই আজকের সবচেয়ে বড় খবরটার কথা মনে পড়ে যায়—তারপর আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলুম আপনিই সাহিত্যিক অমিতাভ মিত্র। সেই থেকে তো ভাবনাই

হ'য়ে গেচে আমার যে, আপনার ডান হাতটা না গেলে বাঁচি। তাহলে দেশ অনেক কিছু হারাবে আপনার কাছ থেকে। আমি ডাক্তারকে ঐ জন্তে বারবার জিজ্ঞেস করলাম—হাতটা ঠিক হ'য়ে যাবে তো। শাশ্বতী ব্যগ্র হইয়া চাহিয়া ছিল সেই লোকটির মুখের দিকে। লোকটি বলিতে লাগিল, ডাক্তার অবশ্যি বললেন, ও কিছু নয়, দিনে অসংখ্য লোকের এই রকম চোট লাগচে। সবাই তাহলে হাতকাটা পাকাটা হ'য়ে ঘুরে বেড়াত। তাহারা বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে রামচরণ দরজা বন্ধ করিয়া বোধ করি অমিতাভ এবং শাশ্বতী উভয়কে লক্ষ্য করিয়া বকিতে বকিতে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। শাশ্বতী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, রামচরণ তোমার একটা কাজ এখনও বাকী আছে বাবা। আমার বাবা এতক্ষণ সারা কলকাতা খুঁজে বেড়াচ্চেন আমায় বোধ হয়। তুমি কাছেপিটের কোন বাড়ী থেকে বাবাকে একটা টেলিফোন ক'রে দাও। বলবে, তোমার বাবুর কাছে এত নম্বর বাড়ীতে আছি। তবে বাবুর অসুখের কথা এখুন ব'লনা তাহলে রাত্রে আসতে গিয়ে আবার একটা বিপদ বাঁধাবে। কাল সকালেই আসতে ব'ল। এই নাও টেলিফোন নম্বর—বলিয়া একটা কাগজে টেলিফোন নম্বরটি লিখিয়া দিল। কাছাকাছি কার টেলিফোন আছে?

রামচরণ বলিল, এ আর এমন কি কাজ, পাশের বাড়ীতেই টেলিফোন আছে। বাবুর নাম ক'রলেই এখুনি ফোন ক'রতে দেবে।

শাশ্বতী অমিতাভের শিয়রে দাঁড়াইয়া কহিল, যন্ত্রণা কিছু আছে নাকি গো? বল না, মুখ অমন গম্ভীর ক'রে আছ কেন?

অমিতাভ স্মিতহাস্যে কহিল, যন্ত্রণা খুবই হ'চ্ছিল, কিন্তু তোমায় দেখা মাত্রই সমস্ত যন্ত্রণার উপশম হ'য়ে গেচে শাশ্বতী।

শাশ্বতী অমিতাভের কণ্ঠ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িয়া ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে কহিল, ওগো, আর ব্যঙ্গ ক'র না, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা আর দিও না, আমি সইতে পারব না।

—অমর-সাহিত্যের রচয়িতা আমিও যদি না হই, অথবা আমার ডান হাত যদি অকেজো হ'য়ে যায় চির দিনের মত তুমি, আমায় তাহলে ভালবাসবে শাশ্বতী?

—আবার সেই শ্লেষ! তুমি আর আমায় এইভাবে আঘাত কর না, সত্যি আমি সইতে পারচি না। একজন নারী যদি সেই উদাহরণ রেখে যেতে পারে তাহলে তুমিও কি আমায় সেই নারীর স্বজাতি হিসেবে বিশ্বাস ক'রতে

পার না? তাপসী ফিরে গেছে মনের অন্ধকারকে ঘুচিয়ে অমরনাথের কাছে। তার দৃষ্টান্ত দেখে আমার মনের আঁধারও কি ঘুচবে না? সে আমার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেচে, আমার দম্ভকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেচে তাপসী।

অমিতাভ বাম হস্ত দিয়া শাশ্বতীর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল, শাশ্বতী।

শাশ্বতী অমিতাভের বুকের উপর মাথাটি রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বল।

—শেষ—